মরণ-রহস্য।

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্যামদাস ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক—

সম্পাদিত

ও

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীশ্যামদাস ব্রহ্মচারী।
শ্যামল কুটীর।
ময়নামতী, (কুমিল্লা।)

Printed by C. C. Dutt.
at Sailendra Printing Works, Tezpur.

উপহার।

শ্রী

উৎসর্গ পত্র।

আলেখ্য।

চিত্ত-চোর—

চির রহস্যময়ী প্রিয়া মোর

তোরে বাসিয়াছি ভাল,

শ্মশান-বহ্নিতে তাই

হৃদয় করিয়াছ আলো;—

মরণ—গহন—প্রান্তরে

ফিরেছ নিয়ে পান্থরে

দূরে—দূরে

রহস্যময় তব অন্তর-পুরে, তিমির দুয়ারে

ওগো, পাষাণ কুমারী উমা

মানসী—অপ্সরী-চোর,

এবার কেটেছে নয়ন-ঘোর

চিনেছি তোমা'

প্রিয়তমা,—

আমি তোমার তুমি মোর,

বাঁধিনু তাই, দিয়ে এই প্রীতির-ডোর॥

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

পরমপিতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আজ সহস্র প্রকার বাঁধাবিঘ্ন দৈবদুর্বিপাক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মরণ-রহস্য প্রকাশ করিলাম। প্রথমতঃ পুস্তকখানা পূর্ববঙ্গ সারস্বত আশ্রমের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের উন্নতি ও সাহায্যকল্পেই লিখিত হইয়াছিল। এবং সর্ব্ব-সাধারণের সাহায্য এবং উৎসাহ থাকা সত্বেও এতদিন পুস্তকখানা প্রকাশ করিতে পারি নাই। অর্থাভাব, শারীরিক অসুস্থতা ও বিবিধ কারণ বশতঃ পুস্তকখানার অনেক অংশই বাদ দিয়া যাইতে হইল। দ্বিতীয় সংস্করণে যথাসম্ভব উহা পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল। এখন ধর্ম্মপ্রাণ সুধীবৃন্দের নিকট পুস্তকখানা আদৃত হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

২৭শে বৈশাখ।
অক্ষয় তৃতীয়া।
শ্যামলকুটীর
ময়নামতী, কুমিল্লা।

গ্রন্থকার—
শ্রীশ্যামদাস ব্রহ্মচারী।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিষয়

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দ্বিতীয় অংশ।

উপসংহার।

মরণ-রহস্য।

প্রথম অধ্যায়।

১। পরলোক, আত্মা ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি।

(ক) পরলোক ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি।

কুতশ্চ কোঽহং।

কোনামবন্ধঃ কথমেষ আগতঃ
কথং প্রতিষ্ঠাস্য কথং বিমোক্ষঃ॥
* * * *
কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং
কা বা গতির্ম্মে কথমস্ত্যুপায়ঃ॥

(বিবেক চূড়ামণি।)

এই দুস্তর সংসার-পারাবার আমি কি প্রকারে পার হইব, আমার গতি কি হইবে? যাহাতে আমার ভবদুঃখ মোচন হয়, তাহার উপায় কি? আমি কে, এবং কোথা হইতেই বা এখানে আসিয়াছি? জীবের জন্ম কি? মৃত্যু কি? বন্ধন মুক্তিই বা কি?

মরণ রহস্য।

মানুষ মরিলে কি হয়, কোথায় যায়, তাহার অস্তিত্ব কিছু থাকে কি না, না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়? মানব-মনে যখনই ঐসকল চিন্তাধারার উদয় হয়, তখন হইতেই তাহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে থাকে। চিন্তাশীল মানব মাত্রেরই মনে উপরোক্ত চিন্তাধারার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এবং ঐ প্রশ্ন-সমূহের মীমাংসার উপরেই মানবের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

দেখা যায় যে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে একমাত্র মৃত্যুই নিশ্চিত, আর সবই অনিশ্চিত, এবং জীব মাত্রেই মৃত্যু-মুখে দোলায়মান। কারাবদ্ধ ব্যক্তি যেমন খাটিয়া খাটিয়া আপনার মুক্তি-স্বাধীনতা অর্জন করে, দেহবদ্ধ জীবের জীবনও ঠিক তদ্রূপ ভাবেই কাটিয়া যায়। জীবন কেবল মরণের জন্য আয়োজন। কি সংসারী কি বিরাগী, কি ত্যাগী কি ভোগী, সুখী দুঃখী সকলেই যেন আজীবন মরণের কিছু বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত। সকলেরই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জীবনের যবনিকাপাত। সংসারে যত মনুষ্যজাতীয় বা জীব-জাতীয় কর্ম্ম-উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার লক্ষ্য একই। তবে অদৃষ্ট অনুসারে তাহার প্রকারের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, এই যা প্রভেদ মাত্র।

পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়াই ধর্ম্ম। জন্মান্তর ও পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে ধর্ম্ম-কর্ম্মের মূল ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। এ [illegible] কিসের জন্য বা কাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জনিত বাহ্যিক কৃচ্ছ্র তপস্যার দ্বারা পরিবারে থাকে সুখ সম্পদ, [illegible], ইন্দ্রিয় [illegible] তাহা হইতে নিজকে বঞ্চিত করিয়া অতি

দিনহীন ভাবে কালযাপন করিবে? ইহলোকের সঙ্গে সঙ্গেই যদি মানবের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে, তবে ভগবদুপাসনা, কঠোর তপস্যা ও সংযমের প্রয়োজনিয়তা কি? আমরা আর্য্যঋষির বংশধর ভারতবাসী, ধর্ম্মই আমাদের জীবনের বৈশিষ্ট; তাই অস্মদ্দেশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর ও জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভোগে বিশ্বাসবান। ইহা আমাদের মজ্জাগত জন্মগত সংস্কার।

কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রেই মৃত্যুর পর মানবাত্মার ধ্বংস না হইয়া কোন না কোন অবস্থায় অবস্থিত থাকে বলিয়া কথিত হয়। ঐসকল ধর্ম্মমতের কোনরূপ পার্থক্য থাকুক আর না-ই থাকুক, সাধারণ মানবসমাজ ঐ সকল মতের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে না পারিয়া প্রকৃততত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হয়। তন্নিবন্ধন মৃত্যুর পর জীবাত্মার স্থায়িত্ব বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে গুরুতর সংশয়ের অধীন হইয়া কালযাপন করে। সমাজের বিশেষ বিশেষ সাধুমহাত্মাগণ ব্যতীত ও অতি সরলবিশ্বাসী পূতচরিত্রবান ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে প্রায় সর্ব্বসাধারণেই ন্যূন্যাধিক তাদৃশ সংশয়ের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করে বলিয়া প্রতীয়-মান হয়। পরলোক সম্বন্ধে মতানৈক্যের আরও একটি কারণ এই যে, যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ বা আধ্যাত্মজ্ঞান সম্পন্ন সাধুমহাত্মাগণ ব্যতীত সাধারণ মানবগণের মধ্যে কেহই জড়দেহের সংশ্রব ভিন্ন আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষীভূত করিতে সক্ষম হয় না।

এই হেতু ঐহিকজীবনের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার দ্বার স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ-গ্রাহ্য জড়দেহের সংশ্রব ব্যতীরেকে, চৈতন্যময় আত্মার পৃথগস্তিত্ব তাহাদের ধারণাশক্তির অতীত হওয়ায় তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, অস্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া তাহাদের নিকট প্রতীয়মান হয়।

আমরা যে জড়দেহ লইয়া বিচরণ করি, তাহার সম্পূর্ণ অভাব হইলে আমাদের জ্ঞান-চৈতন্য থাকা দূরে থাকুক, তাহার আংশিক অভাব হইলেই বা বৈকল্য ঘটিলেই আমাদের জ্ঞানচৈতন্যের আংশিক বা সম্পূর্ণ অভাব সংঘটিত হয়। জড়দেহের সম্পূর্ণ অভাব হইলে আমাদের জ্ঞানচৈতন্যের অস্তিত্ব কল্পনার অতীত ও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান না হইবে কেন? আমাদের পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় :— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদির কোন একটীর বৈকল্য ঘটিলে তন্নিবন্ধন যেমন সেই সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, এবং মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিলে যেমন মানবের মানসিক বিকৃতি ঘটে, অথবা একেবারেই জ্ঞানচৈতন্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। এই সকল বিষয় আমরা সংসারক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এমতাবস্থায় জড়দেহের বৈকল্য বশতঃ যখন চিরকালের জন্য আমাদের জ্ঞানচৈতন্যের বিলোপ হইয়া মৃত্যু ঘটে, তখন দাহাদি কার্য্যদ্বারা দৃষ্টতঃ জ্ঞানচৈতন্যের আধার বা মূলীভূত কারণ জড়দেহের বিনাশ সাধন করিলেই জ্ঞানচৈতন্যময় আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অনেকে জড়বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জড় পদার্থের বিশেষ বিশেষ

রাসায়নিক মিশ্রণ হইতেই জ্ঞানচৈতন্যময় আত্মার উদ্ভব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানচৈতন্যময় আত্মার পৃথগস্তিত্ব অসম্ভব। অতএব মৃত্যুই মানবজীবনের পরিণাম। এবং মানবের সর্ব্বপ্রকার অস্তিত্ব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং মৃত্যুর পর পাপ ও পুণ্যের ফলাফল ও আত্মার সুখ দুঃখাদি ভোগ সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ এবং অমূলক বটে। এই নিমিত্ত আমরা যতকাল এই পৃথিবীতে স্থূল দেহ লইয়া জীবিত থাকি কেবল সে কালটুকু যে রূপেই হউক :—

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ॥" এই মতবাদ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি।

জড়দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ, মৃত্যু ও জড়দেহের বিনাশ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে অতি সহজেই এই সকল নাস্তিকতার ভাব মানব-হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত পার্থিব উন্নতি, ঐহিকের সুখ সুবিধা ও প্রতিপত্তি লাভের ব্যাঘাৎ ঘটাইয়া অমূলক পরলোক চিন্তায় মনোনিবেশ করা, তদ্বিষয়ক আলোচনা করা এবং ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করা প্রভৃতি বিষয় সকল সময়ের সম্পূর্ণ অপব্যয়ের কারণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। মানবের মনে সহজেই এইরূপ নাস্তিকতার ভাব উদয় হয় বলিয়া সাধারণ মানব পার্থিব স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই চিন্তা করিতে চাহে না। ঘোর সংসারী হইয়া মানব বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। এবং ধর্ম্ম-চিন্তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক মনে করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকে।

এই নিমিত্তই মানব মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও পরপীড়ন প্রভৃতি ধর্ম্মগর্হিত কার্য্যদ্বারা পরস্ব আত্মসাৎ করিয়া ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক আপাত মধুর পাপ বাসনা চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পায়। এবং মৃত্যুই যখন জীবের জীবনের ও কার্য্যাকার্য্যের পরিণাম, এবং মৃত্যুর পরে জড়দেহের ধ্বংসে জ্ঞানচৈতন্যময় আত্মার পৃথগ্‌স্তিত্ব যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখন একমাত্র রাজদণ্ড ও অপরাপর মনুষ্যের প্রতি কৃতকর্ম্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পার্থিব অপকার প্রাপ্তির আশঙ্কা ও যশঃস্পৃহা ব্যতীত আর কিছুই মনুষ্যের পাপ প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক উৎপাদন করে না। অতএব মৃত্যুর পর মানবাত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা সংশয়, পাপপুণ্যের পারলৌকিক ফলাফলে অবিশ্বাস বা সংশয়, সর্ব্ববিধানকর্ত্তা ও সর্ব্বকার্য্যের ফলাফলদাতা সর্ব্বদর্শী সর্ব্ব-নিয়ন্তা ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা সংশয়ই মানবের মনে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির দৌর্ব্বল্য ও পাপ-প্রবৃত্তির প্রাবল্য ঘটাইবার প্রধান কারণ। অপর কারণ প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ঈশ্বরকৃত নিয়মানুসারে পরিচালিত হইয়া আপন আপন সুখ সুবিধার জন্য সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে ও দুর্ব্বলের প্রাণবধ করিয়া সবল জীবন-ধারণ করে। ঈদৃশব্যবহার কি সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হয় না? এবং সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত ব্যতীত কখনও কি উহা সম্ভবপর হইতে পারে? তবে দেখা যায় যে ইতর-প্রাণীদিগের পক্ষে যদি সৃষ্টিকর্ত্তার ঐরূপ ব্যবহার অভিপ্রেত হয়, তবে প্রাণী জগতের অন্তর্ভূক্ত তাঁহার শ্রেষ্ঠ মানব জাতীর পক্ষে সেই নিয়মের ব্যতীক্রম ঘটিবে কেন? জীব জগতের নিয়মানুসারে

মানব জাতি দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিবে, তাহাতে মানব পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবে কেন? বরং দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া সবল সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিবে; ইহাই সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

জীব-জগতের দৃশ্য দেখিয়া মানব-হৃদয়ে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইলেই মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি শিথিল হইবার কারণ ঘটে। এতদ্ব্যতীরেকে লোকের ধর্ম্মে অনাস্থা হইবার আরও একটী প্রবল কারণ লক্ষিত হয় যে, সংসারে অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অনেক পরস্বপহারী, ঘোর অত্যাচারী, তস্কর, দস্যু লম্পট প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়াশক্ত লোক অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, তন্মধ্যে কেহ কেহবা লোকসমাজে ধার্ম্মিক নামে পরিচিত হইয়া নাম যশঃ প্রতিপত্তি লাভ করে, পক্ষান্তরে প্রকৃত সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ নল, যুধিষ্ঠির, প্রহ্লাদ, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ন্যায় ধার্ম্মিকবীরগণও নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় থাকিয়া, রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়া পার্থিব সুখে বঞ্চিত হন। তবে এরূপ বিপরীত ঘটনা ঘটিবে কেন? অতএব স্থূল দৃষ্টিতে কর্ম্মফলের এরূপ বিপরীত অবস্থায়ই মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শিথিল হইবার অপর কারণ বটে। এবং তন্নিমিত্তই মানব কোন্ কার্য্যের পরিণাম সুখকর কোন্ কার্য্যের পরিণাম দুঃখকর তাহা অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া আশু-সুখকর কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকা সঙ্গত বিবেচনা করে। কিন্তু এদিকে যেমন উল্লিখিত যুক্তিতর্কগুলি জনসাধারণের মনে উদিত হইয়া তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে শিথিল করিয়া পাপপ্রবৃত্তিকে

উত্তেজিত করে, অপরদিকে তেমনি লোকচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে সাংসারিক মানবের মনে কতকগুলি বিপরীত বিতর্ক উদিত হইয়াও মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাবল্য ও পাপপ্রবৃত্তির দৌর্ব্বল্য ঘটাইতে দেখা যায়।

সর্ব্বদেশে বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কাল-পরম্পরা এরূপ মত প্রচলিত আছে যে, মানবাত্মা ইহকালেই হউক আর পরকালেই হউক কোন না কোন সময়ে কোন প্রকারে স্বীয় অনুষ্ঠিত কৃত, কারিত ও অনুমোদিত পাপ-পুণ্যের ফলাফল অবশ্যই ভোগ করিবে। কোন কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে পাপ-কার্য্যের ফলস্বরূপ যেরূপ ভীষণ যন্ত্রণা ভোগের বিষয় বর্ণিত আছে, এবং সাধকগণ আপন আপন অভিজ্ঞতা বশতঃ পাপীর নরক যাতনা ভোগের যেরূপ সত্যতা সপ্রমাণ করেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে মানব-হৃদয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত নাস্তিকতার ভাব বহুল পরিমাণে প্রশমিত হইয়া যায়। যদি পাপ-পুণ্যের ফলাফল কিছুই না থাকে, যদি মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব না থাকে, তবে বহুকাল পরম্পরা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রে তদ্বিষয়ের অস্তিত্ব উচ্চৈঃস্বরে এরূপ দৃঢ়তার সহিত ঘোষিত করিবেন কেন? সংসারের ভোগ-বিলাসে নিস্পৃহ, সরল সত্যনিষ্ঠ, মানব-কল্যাণ নিরত যোগী-ঋষিগণ মানবমণ্ডলীর মঙ্গল কামনায় দেহত্যাগের পর আত্মার অস্তিত্ব ও পাপ-পুণ্যের ফলাফল ভোগ প্রভৃতি বিষয় তাহাদের প্রত্যক্ষীভূত বিষয় বলিয়া লোক সমাজে প্রচার করিবেন কেন? এসকল বিষয় কি একেবারেই মূলহীন এবং বিকারগ্রস্থ রোগীর প্রলাপ

বাক্যের ন্যায় অলীক? এরূপ কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না

চার্ব্বাক বা নাস্তিক্য মতবাদ খণ্ডণ।

বৈজ্ঞানিকের যুক্তি সম্বন্ধে দেখা যায়, জড়পদার্থ সকলের বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক সংমিশ্রণ হইতেই জড়ের এমন অভিনব অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে যে, যাহা পৃথকরূপে মিশ্র পদার্থ সকলের কোন একটীতেও বর্ত্তমান নাই। যথা,—

চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিনাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।

(চার্ব্বাক সংহিতা)

গুড় ও তণ্ডুল প্রভৃতি প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্তু ঐসকল দ্রব্য একত্রিত করিলে ক্রিয়াবিশেষে তদ্বারা সুরা প্রস্তুত হয়, এবং তখন তাহার মাদকতা শক্তি জন্মে। সেইরূপ এই দেহ অচেতন ভূত সমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেও সমষ্টির পরিমাণে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। পৃথক্ কোনওরূপ আত্মার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু সাংখ্যকার কপিল এ পক্ষকে খণ্ডণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তণ্ডুলাদি সুরাবীজ দ্রব্য সকলের প্রত্যেকটীর মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে মদশক্তি বর্ত্তমান আছে। তণ্ডুল গুড়াদির পরস্পর সংযোগে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত মদশক্তির আবির্ভাব হয় মাত্র। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, যে পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত তন্মধ্যে চৈতন্যসত্বা সূক্ষ্মভাবে নিহিত ছিল। তাহাদের পরস্পর সংযোগে চৈতন্যের উন্মেষ সাধন হইল মাত্র। যদি বল, পাথর-চূণ ও শীতল জলের মিশ্রণে প্রখর উত্তাপ বা অগ্নির উদ্গম হয়, কিন্তু জড়ের

মিশ্রণে যতই অভিনব অবস্থা বা গুণের উৎপত্তি হউক না কেন, তৎসমুদয়ই সূক্ষ্ম জ্ঞান-চৈতন্য জড়িত জড়ের অবস্থা বা গুণ বই আর কিছুই নহে।

অচেতন জড়ের মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন কোনও অভিনব অবস্থায় জ্ঞান-চৈতন্যের উদ্ভব কখনও কেহ দেখেন নাই এবং তাহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব জ্ঞান-চৈতন্যময় আত্মা মিশ্রিত জড়পদার্থ সকলের অবস্থা বা গুণ হইতে যে স্বতন্ত্র পদার্থ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। হরিদ্রা ও চূর্ণ যোগে এক নূতন বর্ণের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব, এ দৃষ্টান্ত ও সমিচীন নহে। কারণ হরিদ্রা ও চূণের পরস্পর সংযোগে বর্ণের বিলোপ না হইয়া যখন বর্ণান্তরের উৎপত্তি হয়, তখন জড়ভূত নিচয়ের পরস্পর মিলনেও জড় ধর্ম্মান্বিত-বর্ণের উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব; কিন্তু তাহা না হইয়া তদ্বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত চৈতন্যের উদ্ভব হইয়া থাকে; সুতরাং দেহ চৈতন্য নহে। গুড় তণ্ডুলাদির সংযোগে মদশক্তির ন্যায় মানুষের দেহে যদি ভূতসমষ্টিতে চৈতন্য জন্মিত, তবে তাহা এক প্রকারেরই হইত। এবং দেহাবয়ব পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বজ্ঞানেরও ধ্বংস হইত। আবার পূর্ব্ব শরীরের উৎপন্ন সংস্কারসমূহ পরবর্ত্তী শরীরে সংক্রান্তও মনে করিতে পার না, কেন না, তাহা হইলে মাতা কর্ত্তৃক অনুভূত বস্তু গর্ভস্থ শিশু কর্ত্তৃক স্মরণ হইত। মাতা যাহা দেখিয়াছেন মাতার শরীর হইতে উৎপন্ন সন্তান সে সকল বস্তু কেন স্মরণ করিতে পারে না? অতএব দেহ চৈতন্য নহে, দেহাতিরিক্ত চৈতন্যই আত্মা।

স্থূল দেহের বিশ্লেষণ ও আত্মার প্রমাণ।

যে জড়দেহ আশ্রয় করিয়া আত্মা কর্ম্মফল ভোগ করে, তাহা পঞ্চভূতাত্মক। জাগতিক স্থূল পদার্থের কারণ সূক্ষ্ম। স্থূল বৃক্ষাদির কারণ যে সূক্ষ্ম বীজ এবিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। যে জড়দেহ লইয়া আত্মা কর্ম্মফল ভোগ করে, সেই একটী জীবদেহ পঁচিতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে আমরা দেখিতে পাই যে, দেহটীর ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিয়া সেই দেহটীকে স্ফীত করিতেছে এবং মাংসগুলি বহু সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিতেছে, ইহার ফলে শরীরস্থ রস বাহির হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে ঐ দেহটী যেন কোথায় লয় হইয়া যায়। মাংসাদি রূপান্তরিত হইয়া মৃত্তিকাতেই মিশিয়া যায়। দেহস্থরস মহারসে অর্থাৎ মহাজলে, তাপ মহাতাপে, বায়ু মহাবায়ুতে মিশিয়া দেহটীর অস্তিত্ব লয় করিলে সে স্থান আকাশে পরিণত হইয়া মহাকাশে মিশিয়া যায়। এইরূপে দেহটী পঞ্চ অংশে বিভক্ত হইয়া সম্পূর্ণ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়।

এই পঞ্চভূতের সহিত দেহটী রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া কি ধ্বংস হইয়াছে বলিতে হইবে? মৃত্তিকায় নির্ম্মিত ঘটাদি নশ্বর হইলেও উহার উপাদান কারণ পরমাণু নিত্য। ঘটাদি নশ্বর হইল বলিয়া কি পরমাণু সমষ্টিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে বুঝিব? নিশ্চয়ই না। পরমাণু সমূহ যে নিত্য এবং উহার যে ধ্বংস নাই তাহা পাশ্চাত্য মনিষীগণও স্বীকার করেন। বুঝিব যে, যে পরমাণু সমষ্টির সংযোগে বস্তু আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গণ গ্রাহ্য হয় তাহারই বিয়োগ হইয়াছে মাত্র। অতএব অবস্থাভেদে নিত্য পদার্থকেও অনিত্য বলা হয়।

মৃত্তিকা, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ ভিন্ন জগতে আর কোনও পদার্থের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। এই পঞ্চভূতের একের স্থূলত্ব হইতে অন্যের সূক্ষ্মত্ব দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা হইতে জল সূক্ষ্ম, জল হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে আকাশ অধিকতর সূক্ষ্ম দৃষ্ট হয়। যদি আমাদের এই পৃথিবীস্থ সকল মৃত্তিকারাশিকে কোন উপায়ে ধ্বংস করা যায়, তাহা হইলে সে স্থান কোন্ ভূত দ্বারা পূর্ণ হইবে? নিশ্চয়ই জল। এইরূপে জলের ধ্বংস হইলে তেজঃ, তেজের ধ্বংসে বায়ু এবং বায়ুর ধ্বংস হইলে কেবলমাত্র আকাশ দ্বারা পূর্ণ থাকিবে। তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মৃত্তিকা, জল, তেজঃ ও বায়ু রূপান্তরিত হইয়া একমাত্র আকাশেই পরিণত হইল। সুতরাং একমাত্র আকাশকেই উক্ত চতুর্ভূতের কারণ অর্থাৎ বীজ বলিতে কোনই আপত্তি নাই। কেননা, শাস্ত্রেও ইহাই প্রমাণিত। যথা,—

নিরঞ্জনা নিরাকার একদেব মহেশ্বরঃ।
তস্মাদাকাশ মুৎপন্নং আকাশাদ্বায়ুসম্ভবঃ।
ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিকগণও আকাশকে ইথারময় (ether) বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, The subtile medium supposed to fill all space. শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্বারায় ইহা প্রমাণিত যে অন্যভূত সূক্ষ্মে পরিণত হইয়া একমাত্র আকাশরূপই প্রাপ্ত হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী গুণ স্থূলভাবে প্রকাশিত হইয়া

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলে সাকারত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। আর এই গুণপঞ্চ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান কালে স্থূল ইন্দ্রিয় অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং এই অবস্থায় ইহাদিগকে নিরাকার বলা হইয়া থাকে। এই অণুসমষ্টি অতি সূক্ষ্ম ও ইহার গুণ অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের স্থূলশক্তি এই অবস্থায় অণুসমষ্টির সূক্ষ্মগুণের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং তখন ইহা নিরাকার। আবার ইহাই যখন স্থূল ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন ইহাই সাকার।

রস যখন সূক্ষ্ম রূপ-রসময় অর্থাৎ তেজের সহিত অবস্থান করে, তখন ইহা নিরাকার। আবার ইহাই যখন স্থূল জলরূপে অবস্থান করে তখনই সাকার। গন্ধ যখন রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদির সামঞ্জস্য শক্তিরূপে অবস্থান করে, তখন ইহা নিরাকার। কিন্তু ইহাই যখন স্থূল পৃথ্বীরূপে অবস্থান করে, তখনই ইহা সাকার। স্পর্শ যখন গতি-কারণ-শক্তিরূপে অবস্থান করে, তখন ইহা নিরাকার। কিন্তু ইহাই যখন স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুভবনীয় বায়ুরূপে প্রকাশিত হয়, তখন ইহা সূক্ষ্ম আকার বিশিষ্ট। শব্দ যখন অনন্তদেশ ও কালের বিস্তার-কারণ-শক্তিরূপে আকাশে অবস্থান করে, তখন ইহা নিরাকার। কিন্তু ইহাই যখন স্থূল-শক্তিসম্পন্ন শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দরূপে প্রকাশিত হয়, তখন ইহাও সূক্ষ্ম সীমা (আকার) বিশিষ্ট। সূক্ষ্ম অবস্থায় প্রত্যেক শক্তি লয় হইতে হইলে চিন্তার-কারণ-শক্তিতে (আকাশে) লয় হইবে।

রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদির সূক্ষ্মশক্তির সামঞ্জস্য শক্তি সংযোগ-কারণ-শক্তির ঐকান্তিক বিকাশ দ্বারা সংযোগিত হইয়া স্থূল-পৃথ্বীরূপে প্রকাশিত। সুতরাং এই সামঞ্জস্যশক্তি লয় হইতে হইলে পূর্ব্বোক্ত রূপাদির সূক্ষ্মশক্তিতেই প্রচ্ছন্ন হইতে হইবে। সংযোগ-কারণ শক্তি (স্থূলাবস্থায় রস) ইহা খণ্ড-কারণ শক্তি দ্বারা পরাভূত হইয়া বহু অংশে বিভক্ত হয়। এই শক্তি লয় হইতে হইলে খণ্ড-কারণ শক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইয়া এই শক্তিতেই প্রচ্ছন্ন হইবে। যেহেতু সংযোগ-কারণ শক্তি খণ্ড-কারণ-শক্তির অন্তর্মুখীন অবস্থা। কারণ-শক্তি পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়া যে স্থান হইতে অন্তর্মুখীন হইতে আরম্ভ করে, সে স্থান হইতে সংযোগ-কারণ-শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। এই খণ্ড-কারণ-শক্তি যখন অন্তর্মুখীন হইয়া সূক্ষ্মভাবে অব্যক্ত অবস্থায় উপস্থিত হইতে থাকে, তখন ইহার খণ্ড-কারণ-শক্তি লয় হইয়া গতি-কারণ-শক্তিরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। সুতরাং এই শক্তি লয় হইলে গতি-কারণ-শক্তিতেই অব্যক্ত হইয়া যাইবে। গতি-কারণ-শক্তি অনন্তদেশ ও কালের বিস্তার-কারণ-শক্তির চরম ব্যক্তাবস্থা। বিস্তার-কারণ-শক্তির অভাব হইলে গতি-কারণ-শক্তি স্থান অভাবে নিষ্ক্রিয়। বিস্তৃতি স্থানের সাহায্যে গতিদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিবৃত্তিলাভ করিব, ব্রহ্মের এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পাত্মক ইচ্ছার চরম অবস্থায় গতিরূপে প্রকাশিত হয়। বিস্তার-কারণ-শক্তি সূক্ষ্ম অবস্থায় শান্ত। কিন্তু যখনই স্থূলরূপে ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতেই গতি-কারণ-শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

সুতরাং এই শক্তি অন্তর্মুখীন হইলেই সূক্ষ্ম-বিস্তার-কারণ-শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। এই বিস্তার-কারণ-শক্তিই **আকাশ।** অর্থাৎ অণুসমষ্টির সম্যাবস্থা। এই অণুসমষ্টি প্রকারান্তরে নিরাকার-শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ভূতাদির মধ্যে আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং নিরাকার। কারণ সাকার পদার্থ আকাশ হইতে স্থূল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যাহা আকাশ হইতে স্থূল, তাহা রূপান্তরিত হইলে আকাশেই পরিণত হয়। আকাশ নিত্য, নির্ব্বিকার ও নিরাকার। যাহা সাকার তাহা অনিত্য এবং অসীম। যাহা নিত্য অনন্ত তাহার আশ্রয়দাতা। নিত্যও অনন্ত হওয়া আবশ্যক। যেহেতু সসীম ও অনিত্য, অসীম ও নিত্যকে আশ্রয় দিতে পারে না। অতএব এই শক্তি নিরাকার, নিত্য ও ভূমা। এইক্ষণ শক্তি সচেতন কি অচেতন?

শক্তির সচেনত্ব প্রমাণ।

শক্তি অচেতন হইলে উহা কি প্রকারে আকাশকে আশ্রয় দিতে সমর্থ হয়? অচেতন পদার্থের ইচ্ছা-শক্তি থাকিতে পারে না। যাহার ইচ্ছাশক্তি নাই, তাহার শক্তির ব্যবহার করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে না সুতরাং এই শক্তি সচেতন। যেহেতু আকাশ আশ্রয়দান করতঃ তাহা দ্বারা অন্য ভূতাদির সৃষ্টি করিতেছে। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই শক্তি চৈতন্য মিশ্রিত। এখন এই শক্তি যদি আকাশ প্রবাশিত করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে ইহার কি গতি হইবে? অবশ্যই এই শক্তিতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অস্তিত্বের লয় করিবে। তাহা হইলে মহাপ্রলয়ে

একমাত্র শক্তি-চৈতন্য বলিয়া একটা কিছু অবশিষ্ট রহিল। পুনঃ এই শক্তি-চৈতন্য-অবস্থা কিছুতে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে কিনা? শক্তি চৈতন্যের আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়, ইহা আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই; কিন্তু চৈতন্য সর্ব্বদাই চৈতন্য, চৈতন্য-শক্তির বিনাশ কে করিবে? এইক্ষণ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই চৈতন্য অবস্থাটী স্ব আশ্রয়েই অবস্থিত। ইহার আশ্রয় অন্য কিছু হইতে পারে না। এবং বিশ্বজগতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় ও জ্ঞান গোচর হয়, তাহার একমাত্র মূলকারণ চৈতন্য-সম্পন্ন অবস্থাটী। শাস্ত্রকারগণ এই অবস্থাটীকেই **ব্রহ্ম বা পরমাত্মা** নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সন্দেহ হইতে পারে ইন্দ্রিয়গণ আত্মা কি না? প্রথমতঃ মনকে যদি আমরা আত্মা বলি, তাহা হইলে আমরা জ্ঞান সুখাদির অনুভব করিতে পারিতাম না। কারণ,—

"ত্বঙ্মনঃ সংযোগা জ্ঞান সামান্যে কারণম্।।"

মনাত্মাবাদ খণ্ডণ।

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের (রূপ রসাদির) সন্নিকর্ষ হইয়া মনের সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মন আত্মা হইলে যুগপৎ দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইত। কিন্তু এককালে দুই বিষয়ে কখনও মন সংযোগ করা যায় না। তাহা পাশ্চাত্য দর্শনও স্বীকার করিয়া থাকে। জ্ঞান সকলের অনুপপত্তিতে হেতু মন, মহৎ, বিভূ বা ব্যাপনশীল পদার্থ নহে; সুতরাং মন অণুপদার্থ। অতএব মনের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। যদি মনই অপ্রত্যক্ষ হইল, তাহা

হইলে জ্ঞান সুখাদি মনের গুণ সমূহ অপ্রত্যক্ষ হইবে, অর্থাৎ চক্ষুষাদি মানস পর্য্যন্ত কোন বিষয়ীভূত হইত না। আমাদের মন ব্যতীত এক ব্যাপনশীল আত্মা আছেন, জ্ঞান সুখাদি উঁহারই গুণ। মন ও রূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উক্ত জ্ঞান সুখাদির অনুভব হয়; ইন্দ্রিয়গণ ও আত্মা নহে। কেন না, তাহা হইলে কোন ইন্দ্রিয় বিনাশে তদিন্দ্রিয় জনিত অনুভব অসম্ভব হয়। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন শ্রবণ ব্যতীত সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান জন্মে না। অতএব সুখ দুঃখাদির অনুভবের জন্য এক অতিরিক্ত অন্তরেন্দ্রিয়ের স্বীকার করিতে হইবে। সেই অন্তরেন্দ্রিয়ই মন। এবং মনের সাহায্যে যিনি সুখ-দুঃখাদির অনুভব করেন, সেই কর্ত্তাই জীবের আত্মা; প্রাণও আত্মা নহে। শাস্ত্রে বলেঃ—

আত্মন এব প্রাণো জায়তে।
যথৈষা পুরুষাচ্ছায়া তস্মিন্ এতদাততম্।
মনঃ কৃতে নায়াত্যস্মিন্ শরীরে।

(প্রশ্নোপনিষদ্)

প্রাণাত্মাবাদ খণ্ডণ।

আত্মা হইতেই প্রাণ জন্মিয়াছে। যেমন পুরুষের ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আত্মাতেই প্রাণ অবলম্বিত। মনের সঙ্কল্প মাত্রেই প্রাণ এই শরীরে আগমন করিয়াছে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও একথা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন "ভৌতিক তত্ত্বাবলীর সাহায্যে প্রাণ পদার্থ কি তাহা জানিলেও জানা যাইতে পারে;

কিন্তু প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব।"* অতএব প্রাণ আত্মা নহে, প্রাণ হইতে আত্মা পৃথক। আবার চক্ষুষাদির করণত্ব অস্বীকার করিয়া স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞানসমষ্টিকেও আত্মা বলা যাইতে পারে না। কেন না, জ্ঞানের সমষ্টি বলিলে পূর্ব্ব-পূর্ব্বজ্ঞানের স্মরণ ও বর্ত্তমান জ্ঞান এই দুইয়ের সমষ্টি বুঝা যায়, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব-জ্ঞানের স্মরণ করিল কে? এবং জ্ঞান সমূহ কাহার নিকটেই বা সদৃশ, আর কাহার নিকটে বা বিষদৃশরূপে প্রতীত হইল? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্রিয়া মাত্রেরই কর্ত্তা আছে। ক্রিয়ার কারকই কর্ত্তা; সুতরাং জ্ঞানেরও জ্ঞাতা আছেন।

"ইচ্ছাদ্বেষ প্রযত্ন সুখদুঃখ
জ্ঞানন্যাত্মনোলিঙ্গমিতি॥"

(ন্যায়দর্শন)

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান আত্মার গুণ। এতাবৎ প্রমাণিত হইল, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানাদি শরীর বা ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম নহে; অতএব বাধ্য হইয়াই দেহে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যথাঃ—

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যো
অভিচাকশীতি॥

(মুণ্ডকোপনিষদ)

---

* Recent advance in physical science. Page—24.

সুন্দর পক্ষযুক্ত দুইটী পাখী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তাহার মধ্যে একটী (জীবাত্মা) সুস্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করেন। আর অন্য বন্ধু (পরমাত্মা) অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র। এই আত্মা "অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানত্মাস্য জন্তোর্নিহীতো গুহায়াম্॥" অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং মহৎ হইতেও মহত্তর এই আত্মা প্রতি প্রাণী সমূহের হৃদয়ে অবস্থিত। যথা,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

গীতা, ১৮। ৬১।

সুতরাং জড়দেহ ভিন্ন জ্ঞানচৈতন্যময় আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকা কখনও অযৌক্তিক বা অসম্ভব নহে।

ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কারণ কি ?

পূর্ব্বে যেমন ইতর প্রাণীগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া সাধারণ মানবমনে নাস্তিকতার ভাব উদয় হয় দেখিয়াছি, এখন অন্য পক্ষ বিচার করিয়া দেখা যাউক। জীব-জগতে ইতরপ্রাণীগণের পরস্পর ব্যবহার, জীবনধারণ প্রণালী, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার প্রভৃতি ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইলে, একদিকে যেমন মানবের মনে যথেচ্ছাচারিতার ভাব ও পাপপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে, অপর দিকে আর একটি বিপরীত ভাব বা বিতর্কও মানবমনে উদিত হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই

ইতরপ্রাণীদিগের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান নাই, পাপ বা পুণ্যের বিচার নাই, স্বীয়কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতাপ, আত্মগ্লানি বা আত্ম-প্রসাদবোধ নাই। ইতরপ্রাণীগণ সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া একই অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদের কোনই উন্নতি বা অবনতি হয় নাই। এবং হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু মানব-সমাজের পক্ষে সেরূপ নহে। মনুষ্যের ভালমন্দ হিতাহিত -জ্ঞান আছে। বিবেকশক্তি আছে, কৃতকর্ম্মের জন্য আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদবোধ আছে। বাক্‌শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। ভগবান ইতরপ্রাণী হইতে মানবজাতিকে বহু শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। সুতবাং ইতরপ্রাণীগণের স্বভাব চরিত্র দৃষ্টে মানবের চরিত্র গঠিত হউক, ইহা কখনই ভগবানের অভিপ্রেত নহে।

ইতরপ্রাণী হইতে মানবের পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় মানব-সমাজ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ক্রমশঃ এরূপ অগ্রসর হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু ইতরপ্রাণীগণ সেই আদিম অবস্থাতেই অবস্থান করিতেছে। অতএব যদি ইতরপ্রাণীগণের স্বভাব চরিত্র দৃষ্টে মানবের স্বভাব চরিত্র গঠিত হয়, তবে সুসভ্য মানব নামের সার্থকতা কি? মহাপুরুষগণ বলেন :—

“আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।
জ্ঞানমধিকং নরানাং বিশেষো
জ্ঞানেনহীনা পশুভিঃ সমানাঃ॥”

আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ও ভয় প্রভৃতি পশুরও আছে, মানবেরও আছে; কিন্তু তদতিরিক্ত মনুষ্যের বিবেকজ্ঞান আছে। পশুর তাহা নাই। মনুষ্য এই বিবেকজ্ঞান শূন্য হইলে অর্থাৎ মানুষ যদি আপনার হিতাহিত ও সদসৎ জ্ঞানশূন্য হইত, তাহা হইলে মানুষ ও পশুতে কোনই পার্থক্য থাকিত না। অতএব ইতরপ্রাণী সমাজের নিয়মানুসারে মানব পরস্পরের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া জীবনধারণ করিবে ইহা কখনই ভগবানের অভিপ্রেত নহে।

বহুলোক সাধন করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি করতঃ প্রভূত ঐশ্বরিকশক্তি লাভ করিয়াছেন, কেহবা সাধন করিয়া ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছেন, আর কেহবা নানাবিধ মেধা প্রতিভাদ্বারা জড়বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া পার্থিব উন্নতি সাধন করতঃ জগতে বহুবিধ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পশু-সমাজে এরূপ কদাচ কখনও ঘটে নাই এবং এরূপ সংঘটন কদাপি সম্ভবপরও নয়। এই সকল বিপরীত বিতর্ক মানবমনে উদিত হইয়া অনেক সময় তাহাকে পশু-চরিত্রের অনুকরণে নিবৃত্তি করিয়া পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতে বিরত করে। পূর্ব্বোল্লিখিত সংসারে দুষ্ক্রিয়াযুক্ত পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণের সুখসমৃদ্ধি ও ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিগণের হীনাবস্থা দর্শন করিলে যে মানবের মনের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দৌর্ব্বল্য ঘটিবার কারণ হয়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থাদিপাঠ ও আধ্যাত্মজ্ঞান সম্পন্ন সাধুপুরুষদিগের উপদেশ ও অভিজ্ঞতার ফলাদি আলোচনা করিলে মানবের মনে তদ্বিপরীত ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। এই প্রহেলিকাময় সংসারক্ষেত্রে কর্ম্মফলের জটিল রহস্য অতিশয়

দুর্ব্বোধ। সাধনকার্য্যে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই প্রহেলিকা ভেদ করিয়া নাস্তিকতার অন্ধকার হইতে সংসারী মানবকে ভগবদ্‌জ্ঞানের দিব্য-আলোক-পথের সন্ধান দেন।

স্থূলদৃষ্টিতে সংসারক্ষেত্রে আপাততঃ জীবের কর্ম্মফল ভোগ সম্বন্ধে অনেক সময় নিয়মের ব্যতীক্রম দেখা যায় বটে, কিন্তু এ ব্যতীক্রম কর্ম্মফলের নিয়ম লঙ্ঘন জনিত ব্যতীক্রম নয়। সংসারক্ষেত্রে দেখা যায়, কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই বা অব্যবহিত পরেই কোনও কোনও কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হয়। আবার কোনও কোনও কর্ম্মফল বহুকাল পর ভিন্ন কিছুমাত্র ফল উপলব্ধ হয় না। অত্যুৎকট কর্ম্মফল কালের অপেক্ষা করে না বিষাক্ত সর্পদংশন জনিত বিষের ক্রিয়া দংশনের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয়। আবার খিপ্ত শৃগাল কুকুরাদির দংশন জনিত বিষের ক্রিয়া আদৌ একেবারে অনুভূত না হইয়া ষণ্মাসান্তে বা তদপেক্ষা অধিকতর সময় পরেও বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে দেখা যায়। অত্যুৎকট পাপফলের সম্বন্ধেও এরূপ উদাহরণ সংসারক্ষেত্রে বিরল নহে। যে সকল দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণ ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইয়া ধর্ম্মের শাসনে তাচ্ছল্য করতঃ ধনমদে, জনমদে, জ্ঞান গরিমামদে মত্ত হইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করে, যাহারা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া পরস্ব অপহরণ করে, পরের প্রাণে প্রতিনিয়ত যাতনা দিয়া আপন পার্থিব সুখ সুবিধার সংবর্দ্ধণ করে, তাহাদের ঈদৃশ দুষ্কার্য্যের মাত্রাবর্দ্ধিত হইতে হইতে যখন অত্যুৎকট পাপেতে পরিণত হয়, তখন সেই পাপের ফল আর

পরকাল অপেক্ষা করে না। ইহকালে অচিরেই তাহাদের অধঃপতন সংঘটন পূর্ব্বক ক্রমে তাহাদিগকে অতি শোচনীয় অবস্থায় নিপতীত করিয়া পরিণামে ভীষণ মর্ম্মভেদী যাতনায় তাহাদের জীবনান্ত করে।

সাধারণতঃ যে সকল ব্যক্তি পাপকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও আপাততঃ পার্থিব সুখে জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের এই সুখময়ী অবস্থা কখনও তাহাদের এজীবনের দুষ্কার্য্যের ফল নহে, উহা তাহাদের পূর্ব্বকৃত সুকৃতির সুখময় ফল বটে। যতদিন সেই প্রারব্ধ জনিত সুখময় ফল নিঃশেষিত না হয়, ততদিন তাহাদের সুখের অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান দুষ্কার্য্যের বিষময় ফল একদিন ভোগ করিতেই হইবে; কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি পাইবার সহজ কোন উপায় নাই। শাস্ত্রে বলে,—"স্বকর্ম্মফলভুকপুমান্।" আর যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ সাধুব্যক্তি নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায়, রোগে, শোকে, দুঃখে অভিভূত হইয়া কালযাপন করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কার্য্যের বিষময়ফল সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়কৃত সৎকর্ম্মের ফল অবশ্যই কালক্রমে তাহার সুধাময় ফল প্রসব করিবে। জীব এজীবনেই হউক বা পরজীবনেই হউক, অথবা উভয় জীবনেই হউক, সে তাহার কৃতকর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিবে। কর্ম্মফল কখনও ব্যর্থ হইবার নয়। কেন না, শাস্ত্রে বলে,—"সতিমূলেতদ্‌বিপাকোজাত্যায়ুঃভোগাঃ।" জীব স্বীয় কর্ম্মফল অনুরূপই জাতি, আয়ু ও ভোগ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন শাস্ত্রাদি আলোচনা

দ্বারা এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ দ্বারা মানবের মনে ঐরূপ ধারণা বা বিতর্কের উদয় হয়, তখনই মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দৌর্ব্বল্য ঘটিবার কারণ হয়।

এইরূপে একদিকে পার্থিব ভোগ-বাসনার প্রাধর্য্য ও নাস্তিকতার ভাব এবং অপরদিকে পরকালের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ও পাপকার্য্যের দুঃসহ যাতনাময় ফলভোগের কল্পিত বিভীষিকা দর্শন, এই দুই বিপরীতভাবের ক্রিয়ার দ্বারা সাংসারিক মানব দোলায়মানচিত্ত হইয়া কখনও আপাতমধুর দুষ্কার্য্যের কখনও বা পরিণাম সুখকর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। এই দুই বিপরীতভাবের মধ্যে যাহার মনে যে ভাবের প্রাধর্য্য বেশী তিনি সেই পরিমাণে সাধু বা অসাধু হইয়া থাকেন। এই জন্যই দেখা যায় যাবতীয় সাধারণ মনুষ্যই ন্যূনাধিক পাপপুণ্যে লিপ্ত। যাহার হৃদয়ে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, পাপপুণ্যের ফলাফলে বিশ্বাস যে পরিমাণে প্রবল তিনি সেই বিশ্বাসের অনুপাতানুসারে সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম-বিশ্বাস যাহার হৃদয়ে যে পরিমাণে দুর্ব্বল, তিনি সেই পরিমাণে পার্থিব সুখের জন্য লালায়িত হইয়া তদনুসারে পাপ-স্রোতে গা' ভাসাইয়া জীবনের সার্থকতা করিতেছেন বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু আমাদের আত্মার সদ্গতি এবং চরম ও পরম মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরকাল ও আত্মার স্থায়িত্বাদি সম্বন্ধে আমরা যাহা বুঝিতে পারি না, যাহা আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত নয় বলিয়া মনে ধারণা করিতে পারি না, প্রভূত বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও গর্ব্বিত হইয়া কখনও আমাদের তাহাকে মূলহীন মনে করা সঙ্গত নহে।

আমরা বিদ্যাবুদ্ধিতে, ধনে-মানে, সাংসারিক প্রতিপত্তিতে যতবড় মনুষ্যই হই না কেন, কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র ও সৌরজগৎ সমন্বিত প্রকাণ্ড অতি প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ও অনন্ত জ্ঞানাধারের তুলনায় আমরা যে কত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নগণ্য পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্রতর, আমাদিগকে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ও অনন্ত জ্ঞানাধারে মিশাইয়া দিলে অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রসহকারে তল্লাস করিলেও কেহ আমাদের অস্তিত্বের অনুসন্ধান পাইবে না। এমতাবস্থায় বিবেচনা করিলে জ্ঞান-গরিমায় গর্ব্বিত হইয়া ধরাকে সরাবৎ জ্ঞান করিবার জন্য আমাদের কি আছে ?—কিছুই নাই।

অতএব জ্ঞানগরিমা, পার্থিব বৈভবাদি-জনিত গর্ব্বিতভাব সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা অতি দীনহীনভাবে ব্যাকুল হৃদয়ে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পরম মঙ্গলময় ভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হই, তবে তিনি আমাদের জীবন-তরীর কর্ণধার হইয়া আমাদিগকে সেই আনন্দধামের বেলাভূমিতে একদিন না একদিন পৌছাইয়া দিবেনই দিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেহত্রয়।

বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে অবস্থা, তাহা অপ্রজ্ঞাত এবং তাহা কোন লক্ষণের দ্বারাই লক্ষিত বা নিরূপিত হয় না; তাহা বাক্যমনের অতীত। সৃষ্টির সেই অবস্থাকে নির্গুণ বলা

হইয়া থাকে। নির্গুণ নিরাকার এই বাক্যমনের অতীত ব্রহ্ম যখন সিসৃক্ষু হইলেন, তখনই তিনি বিকারবান ও সগুণ হইলেন। কেন না, ইচ্ছা হইলেই গুণ হইল এবং যে অবস্থায় ছিলেন তাহার বিকৃতি ঘটিল। এই যে অবস্থা, ইহাই ঈশ্বর। অর্থাৎ সৃষ্টির অতীত হইয়া যিনি নির্গুণ ও নিরাকার অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন, সৃষ্টিকরণেচ্ছাযুক্ত হওয়াতে তিনি সগুণ ও সাকার হইলেন। তথাপি তিনি নিত্য, এবং নির্গুণ ও সগুণ ইহা ভাবজ্ঞেয়। যিনি পূর্ব্বে সূক্ষ্ম ও অতিন্দ্রিয় হইয়া অব্যক্ত ও অচিন্ত হইয়া অবস্থিত ছিলেন, তিনিই ব্যক্তিকৃত হইয়া স্বয়ং প্রকাশ পাইলেন। যথা :—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ স পুরুষবিধ॥"

(শ্রুতি।)

এই আত্মা অগ্রে ছিলেন পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় শির পান্যাদি অবয়ব বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তবে তিনি কি আমাদের ন্যায় মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়াছিলেন? তাহা নয়। যখন সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষকে মানা যায়, তখন তাঁহার শরীরসিদ্ধি অবশ্যই মানিতে হইবে। কারণ তাঁহাকে সগুণ বলিলে গুণের আশ্রয় বলিয়া না মানিলে চলিবে কেন? আত্মার আশ্রয়স্থানকেই শরীর বলে। এই শরীরকে যথাক্রমে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীর কহে। সহস্রারে পরমপুরুষ অবস্থিত ; পরমপুরুষই ঈশ্বরপদবাচ্য। ইঁনিই মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজীবদেহে অবস্থান করিতেছেন। আবার ইনিই অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীবনামে কথিত হন। এই

পরামাত্ম চৈতন্যই মায়া ও অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঈশ্বর ও জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার কারণ হওয়াতে ইহাকে কারণশরীর বলিয়া উক্ত করা যায়। কারণশরীর আদিরহিত, অনির্ব্বাচ্য, মায়াপ্রধান এবং স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর হইতে ভিন্ন। যোগের যে সপ্তমাঙ্গ প্রত্যক্ষতাভাব ধ্যান, সেই ধ্যান দ্বারাই এই একমাত্র কারণশরীরের অনুভব হইয়া থাকে। এই শরীর জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কারণ হওাতে জ্ঞানীগণ ইহাকে কারণশরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

"অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমপীহ কারণং
মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকম্।
উপাধিভেদাত্তু যতঃ পৃথক্‌স্থিতং
স্বাত্মানমাত্মন্যবধারয়েৎ ক্রমাৎ॥"

(রামগীতা, ৩০।)

ভৌতিক আবরণে স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয়শক্তিপূর্ণ মনোময় সূক্ষ্মদেহ আর কেবল বুদ্ধ্যাদিচৈতন্য ও কর্ত্তব্যশক্তির সহিত জীবাত্মা কারণ-শরীরে বাস করে। জীব বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার অংশবিশেষ। পরমাত্মার ভোগ বা ক্ষয় কিংবা লয় নাই, তাঁহার যে তেজঃ সূক্ষ্মদেহের উপর আধিপত্য করে, সেই মনোময় ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা; সেই সত্বা হইতে লিঙ্গদেহ এবং স্থূলদেহ চালিত হয়। এতদ্ব্যতীত যে সকল শক্তিসমষ্টি দ্বারা স্থূলদেহ রক্ষিত ও চালিত হয়, সেই শক্তিকে স্থূলের আত্মা বা ভূতাত্মা কহে। সাংখ্যমতে ইহাই প্রকৃতি।

মন, বুদ্ধি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ, এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে জাত, স্থূলশরীর হইতে পৃথক এবং সুখ দুঃখ ভোগ করিবার যে আধার, তাহাই সূক্ষ্মদেহ ; ইহাকে আবার লিঙ্গশরীরও বলিয়া থাকে। বেদান্তশাস্ত্রে ইহাকে হৃদ্দেশে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলে। এই লিঙ্গশরীরাভিমানী অবিদ্যাপোহিত চৈতন্যই জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ নামে কথিত হইয়া থাকেন। এই জীবই প্রবাহরূপে পাপ-পুণ্যজনিত অদৃষ্টের ভোক্তা। ইনিই লিঙ্গশরীরকে নিমিত্ত করিয়া ইহলোক ও পরলোক গমনাগমন এবং জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় ভোগ করিয়া থাকেন। ইনি অনাদি অক্ষর ও অমর। আকাশাদি পঞ্চ-সূক্ষ্মভূতের প্রত্যেকের সাত্ত্বিকাংশ মিলাইয়া অহঙ্কার, চিত্ত মন ও বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের সৃষ্টি হয়। আর সেই ভূতের সাত্ত্বিকাংশদ্বারা প্রাণ ও অপানাদি পঞ্চবৃত্তিক প্রাণের সৃষ্টি হয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চ, প্রাণপঞ্চ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি অন্তঃকরণ ইহারা সকলেই সূক্ষ্মভূতপঞ্চকের আশ্রয়ে থাকে। উক্ত সপ্তদশটী শক্তি একত্র মিলাইয়া দেহর ন্যায় অথাৎ সূক্ষ্ম-ভাবাপন্ন দেহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই দেহে পরমেশ্বরের হিরণ্ময় জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয়। কারণ ঐ দেহ অতীব স্বচ্ছ। এই দেহকেই সূক্ষ্মদেহ কহে। আর শুক্রশোণিত-যোগে পঞ্চভূতাত্মিকা তনুই স্থূলদেহ। স্থূলদেহ ষড়ভাব বিকারযুক্ত। জাতকের স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি কঠিন পদার্থসমূহ পিতা এবং শোণিত, মেদ, প্লীহা প্রভৃতি কোমল অংশগুলি

মাতা হইতে প্রাপ্ত হয়। শরীরের স্থূলতা, বর্ণ ও ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি ও অবয়বের দৃঢ়তা, অকার্পণ্য, উৎসাহ, তৃপ্তি এবং বল প্রভৃতি রসজভাব অর্থাৎ সপ্তধাতুর অন্যতম ধাতুজ-ভাব ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, প্রযত্ন, জ্ঞান, আয়ু এবং ইন্দ্রিয় এইগুলি জীবের আত্মজ অর্থাৎ প্রাবব্ধ কর্ম্মজভাব।

শরীরে ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ ঃ— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটীকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে।

মন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্তরেন্দ্রিয় আর নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি কহে। সুখ দুঃখ মনের বিষয় এবং স্মৃতি, ভয়, কম্পনাদি মনের ক্রিয়া। অহং মম ইত্যাকার বৃত্তিকে অহঙ্কার বলে। অতীত বিষয়ের স্মরণাত্মক বৃত্তিকে চিত্ত কহে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটিকে অন্তঃ-করণ কহে। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক দেহই জীবের অন্নময় স্থূলদেহ। শরীরে যে পর্য্যন্ত প্রাণাদি বায়ু বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল দেহী জীবিত থাকে এবং দেহের ক্রিয়া সচল থাকে। চৈতন্যের সহযোগে এই জড়দেহে বায়ু প্রাণরূপে সমস্ত দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। দেহ কেবল যন্ত্র মাত্র এবং বায়ু ঐ দেহটাকে চালন করিবার উপকরণ। প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া পুনঃ প্রবৃষ্ট না হইলেই জীবের মৃত্যু সংঘটন

হয়। তখন পুনঃ যে পঞ্চভূতে গঠিত স্থূলদেহ তাহা অপঞ্চী-কৃত হইয়া স্ব স্ব ভূতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর দেহী আত্মজভাব লইয়া সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় পূর্ব্বক স্বীয় অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-ফল ভোগানুকূল স্থান প্রাপ্ত হয়।

অদৃষ্টবাদ।

এই জাগতিক প্রপঞ্চ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, যেন বিরুদ্ধধর্ম্মা দুইটী শক্তিতে নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। প্রকৃতি যেন তদীয়া বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বিনী শক্তির অনুলঙ্ঘনীয় দ্বৈত প্রভাবে দ্বিখণ্ডিতা। এই জগতের পানে তাকাইয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব, জগতের কোথায়ও যেন সমতা নাই। আলোর পাশে আঁধার, হাসির পর কান্না, সুখের পাশে দুঃখ, জীবনের পর মৃত্যু, এইরূপ সৎ অসৎ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, উত্তাপ শৈত্য ইত্যাদি।

বিবিধ বিষয়-বাসনা বিজড়িত সুখ-দুঃখপূর্ণ-সংসারে অসংখ্য মানবসকল—কেহবা নানাবিধ সুখসম্পদ ভোগ করিতেছে, আর কেহবা দুঃখের নির্ম্মম কশাঘাতে মর্ম্মপীড়ায় জর্জ্জরিত হইতেছে। কেহবা শাস্তা হইয়া দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডবিধান করিতেছে, আর কেহবা সে দণ্ড মাথায় পাতিয়া লইতেছে। কাহারও মণিময় সিংহাসনে

আসন, স্বর্ণ থালায় পলান্ন, আর কাহারও বা শাকান্নে বালি, তৃণশয্যায় শয়ন। পরম কারুণিক মঙ্গলময় ভগবান পক্ষপাত-পরিশূণ্য, ছোট, বড়, ধনী, নির্ধনী পণ্ডিত মূর্খ সকলেই তাঁহার সৃষ্ট জীব, তাঁহার সন্তান, তাঁহার নিকট আত্মপর জ্ঞান নাই, তাঁহার দৃষ্টিতে বৈষম্য নাই, পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই, তবে আমরা প্রকৃতির এই দুইটী মূর্ত্তি দেখিতে পাই কেন? এক পক্ষে আমরা দেখি, আমাদের চতুর্দ্দিকে সততা, সদগুণ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, শ্রী, হ্রী প্রভৃতি যে সকল সদ্ভাব বর্ত্তমান থাকিলে জীবনধারণ সুখময় ও শান্তিময় হয় তৎসমুদয়ের চিহ্নই বিদ্যমান রহিয়াছে। অপরপক্ষে দ্বেষ, হিংসা, দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ, শোক ও মহামারী প্রভৃতি যে সকল ব্যাপারে জীবনতিক্ত বা দুঃখময় হইয়া উঠে তৎ-সমুদয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটি যেমন প্রকৃতির হাস্যময়ী প্রসন্নমূর্ত্তি অপরটী তেমনি ভীমা ভয়ঙ্করী। একদিকে বরাভয়দাত্রী অপরদিকে উলঙ্গ—কৃপাণ-হস্তে রণচণ্ডীবেশে প্রকৃতি যেন সংহারকার্য্যে উদ্যতা। প্রকৃতির এই দুইটী বিভাব (Aspects) অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহজীবনে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আমরা উপরোক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের সম্মুখীন হইতেছি। চিরকালই প্রকৃতি এই দুইটি মূর্ত্তিতে বিরাজমানা। কত শত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কতশত জাতির আবির্ভাব তিরোভাব হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতির গতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রকৃতির নিয়ম চিরস্থায়ী ও তাহার গতি শাশ্বতী। প্রাচীন জাতি সমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা তাহার প্রমান পাই।

প্রপঞ্চীভূত জগতের এই সমুদয় প্রতিদ্বন্দী শক্তিনিচয় ও বিরুদ্ধধর্ম্মা ঘটনাবলীর হেতু কি, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চলিতেছে। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক দেশেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিকগণ প্রকৃতির এই সদসং বিভাব রহস্য উদ্ঘাটন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিরূপে এই দ্বৈতের সৃষ্টি হইয়াছিল ও তাহার কারণই বা কি, তাঁহারা তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মানব-চিত্ত, সুখ-দুঃখ ও পাপ-পুণ্যতত্ত্বের যথার্থ মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অসদ্বস্তু জগতে কেন থাকে আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দুঃখ ও যাতনা, অন্যায়ানুষ্ঠান ও পাপই বা কেন থাকে, আর কি উপায়েই বা ইহাদিগের নিরাকরণ হইতে পারে, মনুষ্যগণ ঐ তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধান করিয়াছেন। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম, মত ও দর্শনশাস্ত্র ঐ তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সমুদয় চেষ্টা ও অনুসন্ধান বা ব্যাখ্যা তিনটী নামে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ শুভদর্শিনী (optimistic) দ্বিতীয়তঃ অশুভ দর্শিনী (pessimestic) তৃতীয়তঃ দ্বৈতবিষয়িনী (monistic) প্রাচীন পারসীক বা ইরাণীজাতির "জেন্দ আবেস্তা" নামক ধর্ম্মগ্রন্থে আমরা সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃতির দ্বৈত বিভাবের শুভদর্শিনী-ব্যাখ্যা জানিতে পাই এবং ঐ ব্যাখ্যা অতি প্রাচীন। পারসীকদিগের ধারণা ছিল যে, সদ্বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা একজন এবং অসদ্বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা অন্য একজন। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সদ্বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নাম আন্তরমসদ। আর ব্রহ্মাণ্ডের

যাবতীয় অসদ্বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তার নাম আহ্রমন্। ব্রহ্মাণ্ডের এক-অর্দ্ধাংশের সৃষ্টিকর্ত্তা আহুরমস্‌দ, ইনি শুভানুধ্যায়ী ঈশ্বর। ইনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের যত সদ্বস্তু, সংচিন্তা ইনিই তাঁহার প্রবর্ত্তক। অপর অর্দ্ধাংশ যাহা কিছু অসৎ ও অকিঞ্চিংকর তৎসমূদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা আহ্রমন্। ইনি অশুভানুধ্যায়ী।

প্রাচীন য়িহুদি জাতি যখন বাবিলন্ রাজ্যের অধীন, তখন তাঁহারা পারসীকদিগের ঐ প্রকার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পারসীকদিগের "এরিয়ান ভেজো" নামক স্বর্গই পরবর্ত্তীকালে "ওলড্ টেষ্টামেণ্ট" নামক ধর্ম্মগ্রন্থের গার্ডেন অব ইডেন্ হইয়া উঠিয়াছিল। ইজরেল বংশের জাতীয় দেবতা" ইলোহি জেহোবা" ব্রহ্মাণ্ডের ও যাবতীয় সদ্বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তায় পরিণত হইয়াছিলেন। আবার আহ্রমনের অনিষ্টকারিণী শক্তি জেহোভার পুরাতন ভৃত্য শয়তানের উপর আরোপিত হয়। এই শয়তানই শেষে নিউ টেষ্টামেণ্ট নামক ধর্ম্মপুস্তকোক্ত শয়তান বলিয়া পরিচিত হন। এই সময়েই প্রাচীন হিব্রুজাতি পারসীকদিগের নিকট হইতে স্বর্গ, নরক ও দেবদূত প্রভৃতির ধারণা গ্রহন করিতে থাকেন। পারসীকদিগের ন্যায় ইঁহারাও বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিলেন যে স্বীয় কর্ম্মানুরূপ জীবাত্মা মৃত্যুর পর শাস্তি এবং পুরস্কার ভোগ করিয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহ কবর হইতে উত্থিত হয় এবং জগতের একজন সর্ব্বগুণসম্পন্ন ত্রাণকর্ত্তা আছেন। হিব্রু, খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে সৎ ও অসতের হেতু সম্বন্ধে যে পৌরাণিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, উপরোক্ত প্রকারেই সেই

ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছিল। মুসলমানগণ আজিও পুরস্কার ও শাস্তি, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি ব্যাপারে বিশ্বাসবান।

খৃষ্টান ও হিব্রুজাতি যেমন "ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টে" আস্থাবান, মুসলমানগণও তদ্রূপ। পৃথক ২ কারণ হইতে সৎ ও অসতের উৎপত্তি হইয়াছে, সে কারণগুলিও অনাদিকাল হইতে পৃথক। তাঁহারা বলেন যে "দুঃখ, পীড়া, যাতনা, দুর্দ্দশা ও পাপানুষ্ঠান প্রভৃতি যতকিছু মন্দ ব্যাপার তৎসমুদয়ই শয়তানের কার্য্য। এবং এই শয়তান একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি। তিনি পৃথিবীর শাসক এবং যুবরাজ" (জন, ১২।৩১)। সংক্ষেপতঃ তিনিই মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, যুদাধর্ম্ম এবং মজদ-ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ। এই প্রধান স্তম্ভটী অপসৃত হইলে যাবতীয় পাপ বা অসতের মূল কারণ শূন্য হইয়া যায়। অসৎবস্তু কোথা হইতে আসিল তাহা হইলে তাহার আর কোন নিদান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জগতে পাপ-পুণ্যের কারণ "বাইবেলে" ঐরূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আবার কোন কোন হিব্রুযাজক বলিয়াছেন যে "ঈশ্বর পাপ-পুণ্য উভয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি ঈশ্বর, আর কেহ দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই; আলোক, অন্ধকার সৎ ও অসৎ আমিই সকলের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা। শাস্তি ও পুরস্কার আমারই কার্য্য।" (ইশা: ১৪।১৭)। নিহেমিয়া বলিয়াছেন যে "যত কিছু অসৎ ব্যাপার, তাহাও কি ঈশ্বরই প্রদান করেন নাই" (নিহেমিয়া ১৩।১৮)। সপ্তদশ শতাব্দীর 'কালভীন্' মতাবলম্বীগণ উত্তরকালে উপরোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান তখন তিনি সৎ ও অসৎ উভয়েরই

প্রবর্ত্তক ; নতুবা তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাৎ ঘটে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে যাইয়া তাঁহারও ঈশ্বরকে পক্ষপাতী, অন্যায়বান ও নিষ্ঠুর প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পাপ-পুণ্য, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অদৃষ্ট-বাদের সমাধান কল্পে "সেন্ট আগষ্টাইন্" অদৃষ্টবাদ ও ভগবৎকৃপার অবতারণা করিয়াছেন। উত্তরকালীন কালভিন্ প্রচারিত মীমাংসা অপেক্ষা এই সমাধান উৎকৃষ্টতর নহে। জীবের অদৃষ্ট ও সুখ-সম্পদের কারণ নির্দ্দেশ করিবার পরিবর্ত্তে উহাতে যাতনাগ্রস্তব্যক্তি-বর্গের হিসাবে মঙ্গলময় ঈশ্বরকে অন্যায়বান ও নির্দ্দয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। একজন দুঃখ অপরজন সুখ-সম্ভোগ করিবে পূর্ব্ব হইতে এরূপ ব্যবস্থা কেন হইয়া থাকে ? অদৃষ্টবাদ কোন হেতু নির্দ্দেশ করে না। উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা প্রভাবে অনেক চিন্তাশীলব্যক্তি ঈশ্বরে অবিশ্বাসবান ও অশুভদর্শী হইয়াছেন, পৃথিবীতে অনেক নৃশংস আচরণ ও দুঃখ যাতনার দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা হতাশচিত্তে বলিয়া উঠেন—করুণাময়, ন্যায়বান, মঙ্গলময় ও প্রেমময় বলিয়া কোন ঈশ্বর নাই। 'আগস্ট কোম্ত' আধুনিক মনীষিবৃন্দের অগ্রণী, তিনিও পৃথিবীর এই ভ্রমপ্রমাদ দেখিয়া 'কাস্টাইলের রাজা আলফানসোরের ন্যায় এই প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির সময় যদি আমি উপস্থিত থাকিতে পারিতাম, তবে সৃষ্টিকর্ত্তাকে উৎকৃষ্টতর উপদেশ দিতাম।" আবার মিষ্টার প্লেটো, লিবনিজ এবং মিস্টার ডাক্তার মার্টিনো প্রভৃতি শুভদর্শীগণ মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, "দুঃখ দুর্দ্দশা, ঘাত প্রতিঘাত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্যই

আসিয়া থাকে। এই মঙ্গল জিনিষটীই একমাত্র খাঁটী সত্য। আবার অশুভদর্শীগণ উহার বিপরীত প্রান্তে উপনীত হইয়া বলেন যে, দুঃখ ও দুর্দ্দশাই একমাত্র জীবনের প্রকৃতি। সুখ সম্পদ দৈবাধীন ব্যাপার। জীবিত থাকিতে হইলেই জীবনধারণ করিবার জন্য উৎকট চেষ্টা ও কষ্টভোগ অপরিহার্য্য। মৃত্যু ব্যতীত উহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায়ন্তর নাই। পক্ষপাত পরিশূন্য ন্যায়বান ভগবানের সৃষ্টিতে ও দৃষ্টিতে ঐরূপ বৈষম্য থাকিতে পারে না। কিন্তু হিন্দু ঋষিদিগের বিপুল ধর্ম্মগ্রন্থরাজিতে কুত্রাপি ঐরূপ দৃষ্ট হয় না যে, জগত হইতে স্বতন্ত্র মানবাকারবিশিষ্ট একজন ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যতদিন ঐ মত প্রচারিত থাকিবে ততদিন মঙ্গলামঙ্গলের যথার্থতত্ত্ব ঠিক বুঝা যাইবে না। পাশ্চাত্য মণীষিগণের এখন ভ্রম ঘুচিয়াছে, বিজ্ঞানের আলোকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে জাগতিক বৈষম্যের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন বই দুইজন হইতে পারে না। যাবতীয় নৈসর্গিক-দৃশ্য সেই একই শাশ্বত শক্তির অভিব্যক্তি। এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সেই সনাতনী শক্তিরই বিবর্ত্তনফল। প্রকৃতি অদ্বিতীয়া এবং এক বই দুই নহে। পাশ্চাত্য মণীষিরা বলেন "কোন পদার্থেরই আত্যন্তিক ধ্বংস নাই ;" হিন্দু-দর্শনেরও সেই মীমাংসা। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরকে জীবের পাপ-পুণ্যের বিচারাসনে বসান নাই। বেদান্ত-দর্শনমতে শাস্তি ও পুরস্কার আমাদিগের স্ব স্ব কার্য্যের প্রতিক্রিয়া মাত্র।

তাই শাস্ত্রে বলে:—"স্বকর্ম্ম ফলভুক্‌পুমান্‌।"

বর্ত্তমানের কৃতকর্ম্ম ভবিষ্যতে অদৃষ্টরূপে পরিগণিত হয়। নতুবা একটি সদ্যজাত শিশুকে রোগযন্ত্রণায় বিকলাঙ্গ দেখিলে উহার কর্ম্মফল ব্যতীত কোন্ পাষণ্ড বলিবে যে, মঙ্গলময় ভগবান উহাকে যাতনা দিতেছেন? কার্য্য-কারণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম সুচারুরূপে বুঝিতে পারিলে আমরা আর ঈশ্বরকে বা জগত-স্বতন্ত্র-পাপের সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিন্দা করি না। তখন আর আমরা এ কথা বলি না যে, বহির্দ্দেশ হইতে পাপ ও তজ্জনিত যাতনা-সমূহ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে ;—

"কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণোবশাৎ ॥"

জীব স্বীয় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারাই সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করিয়া থাকে। জগতের বৈষম্যের মূলীভূত কারণই কর্ম্ম। তাই ভাগবতে আছে :—

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মণা।
রাজং স্ততোঽন্যোন্যাস্যাস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ॥

(ভাগবত, ১২।৬।২৫)

অতএব আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, বাহ্য ও অন্তর সকল প্রকার নৈসর্গিক শক্তিই সেই সনাতনী-শক্তির স্ফুরণ মাত্র, তবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমরা সৎ ও অসৎ বলিয়া কোন কিছুই খুঁজিয়া পাই না, সর্ব্বত্র সেই 'ভাগবতীইচ্ছার' অভিব্যক্তি উপলব্ধি করিতে

পারি। কার্য্যকারণেরই ব্যক্তাবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং কারণের প্রকৃতি যেরূপ কার্য্যের প্রকৃতিও ঠিক তদ্রূপই হইবে। যদি একটি সনাতনী ভাগবতী-শক্তিই এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হয়, তবে সমষ্টিভাবে ধরিলে এই ব্রহ্মাণ্ডটী সৎ ও অসৎ কিছুই নহে। আমাদের চক্ষের উপর আপেক্ষিক আদর্শের সংকীর্ণ সসীম-চশমা রহিয়াছে, আমরা উহার মধ্য দিয়া জীবনের ঘটনাবলী দৃষ্টি করিয়াছি, উহা অপসৃত করিয়া মনশ্চক্ষুতে দিব্যদৃষ্টি বা জাগতিক ইচ্ছার অসীম-চশমা পরিধান করিলে তবে আর সৎ ও অসৎ, পাপ ও পুণ্য, শাস্তি ও পুরস্কার এসব আর দৃষ্টিপথে পড়িবে না। সর্ব্বত্র তখন একই কার্য্য-কারণ-ভাবের পরিস্ফুরণ পরিলক্ষিত হইবে। তখন আমরা আর পিতা মাতা কিম্বা শয়তান কি ঈশ্বর অথবা অন্য কাহাকেও নিন্দা করি না। কিন্তু মনে বুঝিয়া লই যে, আমাদিগের যাহা সুখ দুঃখ ভোগ তাহা আমাদের কোন না কোন প্রকারের স্বীয় অনুষ্ঠিত কৃতকর্ম্মের ফল মাত্র।

যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, তড়িৎ যেমন নিজে ব্যক্ত বা অব্যক্ত নহে, কিন্তু চুম্বক প্রস্তরের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইবার সময় ঐরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তদ্রূপ আমরা ধারণা করিয়া লইতে পারি যে, নৈসর্গিক নিয়মাবলী নিজেরা সৎ বা অসৎ নহে; কিন্তু জাগতিক সুবিরাট অয়স্কান্তের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হওয়ায় উহাদিগকে ঐরূপ বলিয়া বোধ হয়। যদি আমরা ধারণা করিয়া লইতে পারি যে, সনাতনী শক্তি বা ভাগবতী ইচ্ছা আমাদের চিত্তও জীবনের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াই কল্যাণ-কারিণী বা অমঙ্গল-

প্রসবিনী বলিয়া বোধ হয়, তবে আবার আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যঋষিদের ন্যায় বলিতে পারি :—ঈশ্বর মঙ্গল ও অমঙ্গলের সৃষ্টি করেন নাই—এবং তিনি কাহারও পাপ বা পুণ্যও গ্রহণ করেন না। তিনি পাপীকে শাস্তি এবং পুণ্যাত্মাকে পুরস্কৃত করেন না, জীব স্বীয় কর্ম্মফলই ভোগ করে। কর্ম্ম-বিধাতাগণ কর্ম্মের বিচিত্র বিধান কার্য্যে পরিণত করেন মাত্র।

আমরা যেন অজ্ঞান ও আপেক্ষিকতার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমান্ধ হইয়া রহিয়াছি, তাই মনে হয় যেন তাঁহার সৃষ্টি মঙ্গলা-মঙ্গল জড়িত, এবং তিনি শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করেন। ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর ভগবান অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, আমাদিগের পাপ-পুণ্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সেই অনুভূতির বহু উর্দ্ধে বিরাজমান। প্রকৃত সত্য আমরা পরিজ্ঞাত নহি বলিয়াই এই ভগবৎ-সত্ত্বা অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সদাসত্তের মায়িকদ্বন্দ্বের অন্তরে যাইয়া ভগবৎ-সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদিগকে যাবতীয় প্রপঞ্চের অক্ষয় প্রস্রবণের সমীপে উপনীত হইতে হইবে, আধ্যাত্মিক একত্বজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে হইবে। সেই ভাগবতী ইচ্ছার ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এইটী হৃদয়াঙ্গম করিতে হইবে যে, সৎ ও অসৎ তাহারই দুইটী বিভাব মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি সৎ ও অসৎ কিছুই নহেন, তিনি গুণাতীত—দ্বন্দ্বাতীত।

চতুর্থ অধ্যায়।

মৃত্যুতত্ত্ব।

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?
চির স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে।"

পরিবর্ত্তন বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তন রীতি। উত্থান পতন, ভাঙ্গা গড়া—কমলালয়ার লাবণ্য শ্রী, চঞ্চলতা মরজগতের ধর্ম্ম। এখানে সকলই ছায়া-চঞ্চল গতিশীল। অবিরত পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর সংসারের কোন বিষয়েরই স্থিরতা নাই, কেবল মৃত্যুই একমাত্র নিশ্চিত। ছায়া যেমন কায়ার অনুগামী, মৃত্যুও জীবের তদ্রূপ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত 'মৃত্যু' জীবের নিত্য-সহচর। শাস্ত্রে বলে:—

মৃত্যু জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্যবাব্দ শতান্তে বা মৃত্যুর্ব্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥
(ভাগবত, ১০।১।২৬)

সুতরাং এই অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্তব্য মৃত্যুর সম্বন্ধে সকলেরই পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকা এবং কথঞ্চিত জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

কেননা, না ডাকিলেও এই অনাহুত অতিথি এক তিথিতে সকলেরই দ্বারস্থ হইবে। মৃত্যুর কালাকাল বিচার নাই, সে কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, কাহারও স্বরূপ কুরূপ দেখে না, তোষামোদ প্রলোভনে ভোলে না, রাজা প্রজা ধনী নির্ধনী সকলেই তাহার কাছে সমান। তাই সময় থাকিতে সকলেরই পথের পাথেয় একমাত্র ধর্ম্ম-ধন সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মৃত্যুর যেমন কালাকাল বিচার নাই, ধর্ম্মকর্ম্মেরও তদ্রূপ কোন কালাকাল বিচার থাকিতে পারে না জীবন্ত' সর্ব্বদাই মৃত্যুর করাল মুখে দণ্ডায়মান। যথা,—

"সদাহি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা।
যদা নরো মৃত্যুমুখে অভিবর্ত্ততে॥"

যে দিন যায়—সেদিন আর ফিরিয়া আসে না, দিনের প্রতীক্ষা করা বৃথা, দিন দিন করিয়া একদিন সেই দিন হইবে যেদিন দীন আর ধনী একই শ্মশান-শয্যায় শেষ-শয়ণ করিবে; তবে কিসের দম্ভ, কিসের অভিমান অহঙ্কার, তবুও দেহের এত গরব কেন? আমার আমার মার্কা অনিত্য বিষয়ের উপর এত জোর দেই কেন?

"আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং
যাতিক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়াস্তি গতাঃ পুনর্ ন দিবসাঃ
কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মী তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা
বিদ্যুচ্চলং জীবনং॥"

বিদ্যুতের মত চঞ্চল জীবন, কাল জগদ্ভক্ষক, ধন জন তরঙ্গভঙ্গের মত চঞ্চল। সাগরের উপরেই চঞ্চল বীচিমালা নীচে নিথর নিস্তব্ধতার মাঝে অনেক ধনরত্নই আছে, নচীকেতা যেমন মৃত্যুর দুয়ার হইতে অমৃত আনিয়া জগতে বিলাইয়া দিয়াছিল, আমরাও তাঁহার মত সেই অমৃতের সন্ধান পাইব না কেন? মৃত্যুর মুখোসটাই কিম্ভূতকিমাকার বস্তুতঃ মৃত্যু মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান, মৃত্যুর অধীপতি যম স্বয়ং ধর্ম্মরাজ। ধর্ম্মের অনুশাসন যাঁহারা মানিয়া চলেন, মরণে তাঁহারা ভীত হবেন কেন? মৃত্যু যে আনন্দধামের বিজয় তোরণদ্বার। তবে মরণে এত ভয় কেন?—

মৃত্যুভয়।

দেখা যায় এ জগতে কেহই মরিতে চায় না; রোগে, শোকে, জরায় বার্দ্ধক্যে জীবের পঞ্জরাস্থি ভগ্ন, তথাপি কেহই মরিতে চাহে না, মৃত্যুর নাম শুনিলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। মরণ-ভয় জীবের সহজাত সংস্কার। এই মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জীবের কতই না চেষ্টা—কতই না আয়োজন! মাতৃক্রোড়ে ভয়ার্ত্ত শিশুর মত এই যে শরীরটাকে আমরা আকড়াইয়া ধরিয়া থাকি, চিরদিন কি তাহা ধরিয়া রাখিতে পারি?—পারি না,—কেউ পারে নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন-বাতির তৈল শুষ্ক হইয়া আলো ক্ষীণ হইতেছে; কালের দুর্দ্দমা-স্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে

চলিতে আছে এবং চলিতে থাকিবেও। উহার গতিরোধ করিতে যাওয়া বৃথা॥ মৃত্যুও পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। চূড়ান্ত পরিবর্ত্তনই মৃত্যু নামে কথিত হয়।

"আমাদের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে, এমন কি সামান্য বিষয় চিন্তা দ্বারাও শারিরীক কোষ সমূহের ধ্বংস হইয়া নূতন নূতন কোষ সমূহের সৃষ্টি করিতেছে। আমাদের মস্তিষ্কে ত্রিশ কোটি স্নায়ুকেন্দ্র আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির এক একটি স্বতন্ত্র কার্য্যাস্থল। প্রত্যেক কেন্দ্র ষাট দিন মাত্র জীবিত থাকে; সুতরাং একটি মনুষ্যের সমস্ত মস্তকটি দুই মাসে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।" * কিন্তু বাহিরে আমরা কোনও প্রমাণ পাইতেছি না; এবম্প্রকার পরিবর্ত্তন প্রতিমুহূর্ত্তেই হইতেছে। সুতরাং প্রতিমুহূর্ত্তেই মৃত্যুর ক্রিয়া আমাদের ভিতর হইতেছে। কিন্তু বাহিরে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিতেছি না, বা লক্ষ্য করিতেছি না। এমনি ভাবে তিলে তিলে পরিবর্ত্তিত হইয়া একদিন বার্দ্ধক্যের শেষ সন্ধ্যায় জীবন উপনীত হইবে। ** জ্ঞানীগণ ইহা অবগত হইয়া বিচলিত হন না। যেমন একটি ফুলের কুঁড়ি দিন দিন করিয়া বাড়িতে বাড়িতে একদিন পূর্ণরসে পূর্ণগন্ধে প্রস্ফুটিত হইয়া আবার বাসি হইলেই ফুলের পাপড়ীগুলি ঝরিয়া ফুলটি শুকাইয়া বা মরিয়া যাইবে; কিন্তু তাহাতে তাহার ক্ষতি কি? ফুল ঝরিয়া সু-রসাল ফলের সৃষ্টি করিবে। জগতের এই ভাঙ্গা গড়া না থাকিলে স্থবিরের আর্ত্তনাদে ব্রহ্মাণ্ড

---

* বাইওকেমিক মেটেরিয়া মেডিকা।

** গীতা—দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩ শ্লোক।

বধির হইত না কি? জগত নিত্য নূতন রসে প্রস্ফুটিত বলিয়াইত এত সুন্দর দেখায়। জগৎপ্রসবিনী মা মোহিনী মূর্ত্তিতে প্রসব করিয়া জননীর শান্ত মূর্ত্তিতে পালন করেন, আবার সংহারিণী মূর্ত্তিতে সংহার করেন। তাই এক হাতে মায়ের উলঙ্গ কৃপাণ অন্য হাতে অভয়দান।

মৃত্যু কি?

মনুষ্য যেমন জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তদ্রূপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। † এই অভিনব দেহ অর্থে অন্য একটী স্থূলদেহ বুঝিতে হইবে না। সেরূপ হইলে স্বর্গ নরক প্রভৃতি যাবতীয় ভোগ্যলোক মিথ্যা, এবং শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি তাবৎ পারলৌকিক কার্য্যই নিরর্থক হইয়া উঠে; এই অভিনব দেহ অর্থে আতিবাহিকদেহ। স্থূলদেহ হইতে জীবাত্মার প্রয়াণই মৃত্যু। জীবাত্মা স্থূলদেহকে ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তও বিদেহাবস্থায় থাকে না, তাই জীবাত্মার এক নাম দেহী। গরুড়-পুরাণে উত্তরখণ্ডে উক্ত আছে:—

"যথা তৃণজলৌকেব দেহী কর্ম্মানুগোবশঃ।"

অর্থাৎ জলৌকা (জোঁক) তৃণ হইতে তৃণান্তরে যাইতে হইলে যেমন এক তৃণকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব তৃণকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে, তদ্রূপ জীবাত্মাও এক দেহকে আশ্রয় করিয়া দেহান্তর গ্রহণ

† বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ (গীতা, ২।২২

করিয়া থাকে। জীব যে স্বভাবাপন্ন হইয়া অদৃষ্টবশে প্রকাশ পায়, সেই অদৃষ্ট-নাশে স্বীয় স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গেই স্থূলদেহেরও বিনাশ হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন অবস্থাকেই মৃত্যু কহে। জীবের পরমায়ু যাহা লিঙ্গ-শরীরের সত্তা নামে অভিহীত হইয়া থাকে তাহাকেই জীবের ভোগ্যতেজঃ বা আয়ু কহিয়া থাকে।

যতদিন জীবের ভোগবাসনা থাকে ততদিন তাহার এই ভোগ-শরীরও থাকে। জীব স্থূলশরীরে যে বিষয়ে ভাবনা প্রযত্নাদি করিয়া থাকে, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতি লইয়া ভোগ্য-লোকে তাহাই ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং জীবের কর্ম্ম, সংস্কার, ভাবনা প্রযত্নানুসারেই মৃত্যু কাহারও নিকট ভয়াল, কাহারও নিকট দয়াল হয়। যাঁহারা এই জগৎকে এক অখণ্ড প্রেমময়ের সত্তা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, মরণ তাঁহাদের নিকটই মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান এবং শান্তির আবাসস্থল। তাই প্রেমিক কবি হাফেজ গাহিয়াছেন:—

"যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত
রে মৃত্যু! তাহারি তুমি স্মরণি নিশ্চিত।
কোনরূপে অতিক্রম করিলে তোমায়—
সফল হইবে আশা, যাইব তথায়॥"

মৃত্যু অর্থে পরিবর্ত্তন হইলেও সম্পূর্ণভাবে আমূল পরিবর্ত্তন নহে, যাহাতে জীবের ব্যক্তিগত চরিত্র একেবারে বিনষ্ট বা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মৃত্যু জীবের ক্রম উন্নতি ও আত্মার অনন্তজীবন লাভ এবং অনন্ত অনুভূতির উপায় স্বরূপ বলিয়া মহাপুরুষগণ কীর্ত্তন

করেন। যেমন একটি ফুল মরিয়া একটি সু-রসাল ফলের সৃষ্টি করে। আবার ঐ ফলে অসংখ্য ফুল ফলের সৃষ্টি করে। বিবর্ত্তনবাদ সর্ব্ববাদী সম্মত মত। ক্রমোন্নতির পথে সকলেই পূর্ণত্বের দিকে প্রধাবিত। তাই চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্ম -লাভের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। মরণ বলিলেই আমরা ব্যক্তিগত জীবনের অবস্থা ও আবাসস্থলের মাত্র একটা পরিবর্ত্তন বুঝিয়া থাকি। সকল জিনিষই পুনঃ পুনঃ জন্মাইতেছে ও মরিতেছে। বিশ্ব-সংসারই জীবন-মরণের লীলাভূমি। প্রকৃতি স্বয়ং চঞ্চলা, চঞ্চলতাই প্রকৃতির স্বভাব, স্বভাবের আর কোন হেতু নাই; সুতরাং যতদিন না প্রকৃতি মহাকালের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, ততদিন অব্যাহত গতিতে এ সৃষ্টি ক্রিয়া চলিতেই থাকিবে।

সুধাকর যেমন কত আশা, কত প্রেম, কত ভালবাসা বুকে বহিয়া যৌবনের অভিসারে এক এক কলা করিয়া পা বাড়াইয়া একদিন ষোলকলায় ষোড়শীরূপে পূর্ণযৌবনে উপনীত হয়, জীবের জীবনও ঠিক তেমনি ভাবে কত আশা, কত ভালবাসা, কত লালসা আরও কত কি বুকে বহিয়া একদিন পূর্ণযৌবনে পদার্পন করে। এই যৌবনেই দেহের, মনের এবং ইন্দ্রিয়গণের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। আবার ফুল্লাননা কলানিধি যেমন প্রিয়তমের সন্ধান না পাইয়া ম্লানমুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া একদিন অমানিশার অন্ধকার কুটিরে প্রবেশ করে, জীবাত্মার পূর্ণ অধিকার শরীরে ও মানসরাজ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া তেমনি পূর্ণযৌবন হইতেই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। দিন দিন করিয়া প্রতিদিন ইন্দ্রিয়বৃত্তি শিথিল হইয়া আসে এবং মনোবৃত্তির

ধ্বংস হয়। আর ইন্দ্রিয়গণ সহ জীবাত্মা অতি সন্তর্পণে দিনমনির অস্তাচলে গমনের ন্যায় প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে স্বীয় পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়।

বার্দ্ধক্যে যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তিসমূহ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, দেহও আর উন্নতিশীল আত্মার সহিত সমানে চলিয়া উঠিতে পারে না, তখন আত্মা পাঞ্চভৌতিক অন্নময় দেহ অকর্ম্মণ্য ও ভোগের অনুপযুক্ত দেখিয়া মৃত্যুলগ্ন উপস্থিত হইলে উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূক্ষ্মদেহ ধারণ করতঃ আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিতে যান। তখন স্থূলদেহ আপ্রাণ চেষ্টায় আত্মাকে আপনার মাঝে টানিয়া রাখিতে চায়। উভয়ের টানাটানির প্রভাবে জীবের মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে নানাবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতভাব দেখা যায়। অনেকে হয়ত জীবের ঐরূপ মৃত্যুলক্ষণ দেখিয়া তাহা রোগীর মৃত্যু-যন্ত্রণা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার মৃত্যু-যাতনা না হইয়া আত্মার মুক্ত হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার লক্ষণই বটে। আমরা বাহিরে রোগীর শরীরের সঙ্কোচ, চোখের জল, নিঃশ্বাসের ক্লেশ ইত্যাদি কষ্টকর লক্ষণগুলি দেখিয়া উহা রোগীর মৃত্যু-যন্ত্রণা বলিয়াই মনে করি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উহা তাহার যন্ত্রণার লক্ষণ না হইয়া উহা তাহার অন্তরাত্মার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের বহির্বিকাশের লক্ষণই বটে। সৎলোকের মৃত শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যেন, তখন পর্য্যন্তও সেই মুখ খানা হাসিমাখা। কি যেন এক স্বর্গীয়দীপ্তি অপার্থিব শান্তি ও আনন্দের সুস্পষ্ট রেখা তড়িতের মত তাহার

মৃত্যু-যন্ত্রণা।

মুখমণ্ডলে খেলিতেছে। ইহা দেখিয়া মনে হয় না কি যে, মরণের মত সুখ নাই, মরণ-বঁধুর মুখ দেখিয়া তখন কি বলা যাইতে পারে না যে জীবন-বাসরে এমন অবসরটী আর পাওয়া যায় না।

জীবনের শেষমুহূর্ত্তে জীবাত্মার আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। এবং সুদূর ভবিষ্যতের আলেখ্য, অনন্ত ভাস্বর বৈভব ও ভবিষ্যৎ আবাসভূমির দৃশ্য তাহার দৃষ্টিপথে প্রতিফলিত হইতে থাকে। এই দৃশ্য দেখিয়া স্বীয় কর্ম্মফলানুসারে কেহবা হর্ষ কেহবা বিমর্ষ কেহবা ভীত, চকিত অপরাধীর ন্যায় সন্ত্রাসিত হয়, আর কেহবা আনন্দিত, আহ্লাদিত হইয়া দিব্যদেহে আপনাকে সুখান্বিত মনে করে।

কাল-নিদ্রা।

মৃত্যুর ক্রিয়া দুই প্রকারে হইয়া থাকে। এক সজ্ঞানে অপর অজ্ঞানে। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি তৈলহীন বর্ত্তিকার ন্যায় জ্বলিয়া পুনঃ নিস্তেজ হইয়া একপ্রকার গভীর নিদ্রার ভাব আনয়ন করে। জ্ঞানীগণ এই সময়ে সজাগ থাকিতে চেষ্টা করিবেন, তখন অনুভব হইবে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া ঘুম আসিতেছে, কিছুতেই যেন আর নিজকে সজাগ রাখিতে পারিতেছে না। তবুও জোরপূর্ব্বক সচেতন থাকিয়া স্বীয় ইষ্ট-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। কেন না মরণ সময়ে যে, যে ভাবকে স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিবে সে তদ্ভাবকেই প্রাপ্ত হইবে। তাই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, :—

যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
(গীতা, ৮।৬)

তখন দেখিতে পাইবে যেন রক্ত-মাংসময় দেহটা ছাড়িয়া পরমানন্দময় অমর জীবন লাভ করিতে যাইতেছি। যেখানে জগতের বাদ বিসম্বাদ, সকলই জ্ঞানগোচর হইবে, সুখের রহস্য বুঝিতে পারিবে। কর্ণে স্বর্গীয় শান্তির সুর-লহরী, নয়নে বিশ্ব-বিমোহন কত অভিনব দৃশ্য—বেলোয়ারী ঝাড়ের কলমের ভিতর

দিয়া দেখিতে যেমন সুন্দর নানা রকমের রং দেখা যায়, সেইরূপ দেখিতে পাইবে। বাহ্য এবং অন্তর্জ্জগতের বিষয় সকল তখন যুগপৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে আসিবে। মনে হইবে যেন বিশ্বসংসার একটা অবিশ্রান্ত সুর-লহরী, আমি যেন সঙ্গীতের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি। মৃত্যুসময়ে এদেশে প্রবাদ আছে বদ্ধস্থানে মৃত্যু হওয়া শুভ নয়, তাই বলিয়া আসন্ন সময়ে তাহাকে টানাটানি করা নিতান্তই অনুচিত। ইহাতে তাহার প্রয়ানের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। অজ্ঞানতঃ যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারা প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যুর পরে চেতনা পাইয়া থাকে। অবস্থান্তরে পড়িয়া কিছু সময়ের জন্য স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বিচরণ করে। সূক্ষ্ম-জগতে অনেক সূক্ষ্ম-দেহধারী আত্মা আছে, মৃত্যু-সময়ে তাহারা মৃতকে সঙ্গে করিয়া নিয়ে যায়।

দেহের মায়া।

মানবের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মাও চৈতন্যের রাজ্যে অধিকতর অগ্রসর হইতে থাকে। যখন সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মা মূত্র-বিস্টাময় লালসাপূর্ণ এই জঘন্য বাসনা কামনার আশ্রয়স্থল স্থূল আধার হইতে আপনার সেই মহীয়ান, গরীয়ান স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে; তখন এই পূতিগন্ধময় জড়দেহ অতি অপবিত্র অতি ঘৃণ্য বলিয়াই তাহার নিকট বোধ হয়। তখন সেই অসার-দেহ আর আত্মার কোন কাজেই আসে না, কিন্তু যে শরীরের সঙ্গে সে এতদিন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া সুখ-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে, হাসি-

কাম্নায় ঘর-কন্না করিয়া আসিল, আজ হঠাৎ সেই আজন্মবন্ধুর নির্ম্মম বিয়োগ যাতনা সে কি করিয়া সহিবে? তাই, তখনও হৃদয়, ধমণী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রসমূহ আত্মাকে দেহ হইতে ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না। আলিঙ্গনবদ্ধ পেশীমণ্ডলী, আপনার সঙ্কোচ প্রসারিণীশক্তি, গতি-আদান-প্রদান-শক্তি তখনও করিতে চাহে। ধমণী, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি রক্তসঞ্চালন-যন্ত্র তখনও জীবনী-শক্তির জন্য লালাইত; শিরায় শিরায় তখনও অনুভূতি, মস্তিষ্ক তাহার বুদ্ধিবৃত্তি এবং দেহাত্মকজ্ঞানকে ধরিয়া রাখিতে চাহে। মাতৃজঠরে মিলিত সেই দুই বন্ধু—দেহ আর আত্মা উভয়ে উভয়ের আসন্ন অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদকে নিবারণ করিতে চাহে। এইরূপে মৃত্যুকালে উভয়ের আকর্ষণ বিকর্ষণে দেহে নানারূপ অঙ্গবিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সে সময়ে দেহাত্মবোধের বা শারীরিক ব্যাধির যন্ত্রণা অনুভবের জ্ঞান থাকে না, মন সে অনুভূতির অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়।

মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

মূলাধার পদ্মই জীবের শক্তিকেন্দ্র। এই মূলাধারে দ্বিমুখ-বিশিষ্ট সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকৃতি কুণ্ডলিনী-শক্তি এক মুখ ব্রহ্মবিবরে রাখিয়া ব্রহ্মদ্বার রোধ করতঃ নিদ্রা যাইতেছেন ; আর অন্যমুখ যাহা দণ্ডাহত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে, তাহা হইতেই জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ হইতেছে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবের প্রাণ। শ্বাস বায়ুর নির্গমকালে "হং" কার ও প্রবেশকালে "সঃ" কার উচ্চারিত হয়। যথা, "হংকারেণ বহির্যাতি, সঃকারেণ বিশেৎপুনঃ॥" এই "হং" ভিতর হইতে সত্তের অংশ টানিয়া লইয়া বাহির জগতে ঢালিয়া দিয়া প্রকৃতির পরিপুষ্টতা সাধন করিতেছে ; আর "সঃ" বাহিরের রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি ভিতরে টানিয়া লইয়া সত্তের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে। "হং" শিব বা চৈতন্য পুরুষ বা মৃত্যু। আর "সঃ" অর্থে শক্তি বা প্রকৃতি অথবা জীবনী-শক্তি "হং"কাররূপে নিশ্বাস যদি শক্তিরূপা "স"কার দ্বারা ভিতরে পুনঃ আকর্ষিত না হয়, তবেই জীবের মৃত্যু। "হংস" শ্বাস-প্রশ্বাসের মিলন, এই হংসই জীবের জীবাত্মা।

মূলাধার হইতে হংসধ্বনি উত্থিত হইয়া জীবাধার হৃদপদ্মে (অনাহতকমলে) ধ্বনিত হইতেছে। নাভীর উর্দ্ধদিকে প্রাণবায়ু আর নিম্নদিকে অপাণবায়ু। এই দুই বায়ু একত্র হইয়া উর্দ্ধমুখীন

হইলেই জীবের মৃত্যু হইয়া থাকে। পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশের আধারস্বরূপ জীবাত্মা মহা-তেজোময় হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধগমণোন্মুখী হন ; এবং ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং ললনাচক্রভেদ করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে নিরুদ্ধ হয়। এই সময়েই রোগীর শিবনেত্র হইয়া থাকে। সৌভাগ্যবান পুরুষই উহার পরমুহূর্ত্তে মহাতেজের সহিত ব্রহ্মরন্ধ্র-ভেদ করতঃ স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হন। মধ্যম অধিকারীর প্রাণবায়ু উদানবায়ুর সহিত দক্ষিণ নাসাপথ দ্বারা, এবং নিম্ন-অধিকারীর বাম নাসাপথ দ্বারা বহির্গত হইয়া থাকে। জীবদেহে এক একটি পদ্ম এক একটি শক্তিকেন্দ্র।

উদান বায়ুর সহিত প্রাণবায়ু যখন দৈহিক সমস্ত শক্তিসহ উর্দ্ধমুখীন হইতে থাকে তখন উক্ত এক একটি পদ্ম পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শক্তিকেন্দ্রগুলিও শক্তিহীন, অসার এবং শীতল হিমবৎ হইয়া যায়। মূলাধার পৃথ্বিতত্ত্বের স্থান এবং পর পরগুলি যথাক্রমে জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশতত্ত্বের স্থান। মনিপুরে ব্রহ্মগ্রন্থি অনাহতে বিষ্ণুগ্রন্থি, আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি যথাক্রমে ভেদ করিয়া অনন্তর সোমচক্রের মধ্য দিয়া সুষুম্নামুখের নীচে কবাটস্বরূপ অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার মণ্ডল ভেদ করতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল কমলে পরম পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়া উত্তম অধিকারীর আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হয়, আর মধ্যম অধিকারীর আত্মা দক্ষিণ এবং নিম্ন-অধি-কারীর আত্মা বামনাসাপথে বহির্গত হয়। এই মৃত্যুসময়ে মৃতের মস্তিষ্কের চারিদিকে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম—স্নিগ্ধ জ্যোতিষ্মান্ মণ্ডল

প্রকাশ পায়। মৃতের মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধাধঃপিণ্ডের গভীরতম অংশগুলি বিকশিত হয়। জীবন্ত অবস্থায় যে জীবনী তড়িৎ ও চৌম্বকিক-শক্তি শরীরের অধঃস্তন বৃত্তিগুলিকে অনুপ্রাণিত করিয়া ছুটিত, তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া কেবল মস্তিষ্কে আশ্রয় লয়; অর্থাৎ স্বাভাবিক সুস্থ ও জীবন্ত অবস্থা অপেক্ষা তখন অন্যান্য শারীরিক বৃত্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। স্থূল শরীর ধ্বংস হইলেই তাহার পরক্ষণে ঐরূপ বৃদ্ধি সকল জীবের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।

জীবের সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুর ক্রিয়া আরম্ভ হইলে তদীয় সর্ব্বাঙ্গ, মস্তিষ্ক এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে অনুভূতি, তাড়িৎ, চৌম্বকিক-প্রভৃতি শক্তি আকৃষ্ট হইয়া শিরোমণ্ডলের বহির্ভাগে জ্যোতিষ্মান-মণ্ডলের গঠন করে। শরীরের নিম্নভাগ যতই শীতল ও মলিন হইতে থাকে সেই পরিমাণে ঊর্দ্ধভাগে উক্ত জ্যোতিষ্মানমণ্ডলের দীপ্তিও ক্রমশঃ ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যাঁহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিয়াছে তাঁহারা তাঁহাদের মৃত্যুসময় নিজ নিজ মস্তকের চারিদিকে সূক্ষ্মব্যোমে আপন মস্তকের অনুরূপ অন্য আর একটি মস্তকের একটি সুস্পষ্ট সূক্ষ্মরেক্ষা দেখিতে পান; কিন্তু যাহারা একেবারে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিবিহীন, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ দর্শন অসম্ভব। কেন না, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেই আধ্যাত্মিকতত্ত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহাই নিয়ম, অন্যথা অসম্ভব।

ক্রমে ক্রমে সেই জ্যোতিষ্মান্ মণ্ডলের অস্পষ্ট রেখাটী বেশ সুস্পষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে সেই জ্যোতিঃরাশি ঘনীভূত হইয়া একটি আলোকময় মস্তকের সৃষ্টি করে। ঠিক মাতৃ-জঠরে যেরূপ ভাবে

স্থূলদেহটীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একাধিকক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এই আতিবাহিক দেহেরও আধ্যাত্মিক-জগতে জন্ম ও সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠনক্রিয়া তদ্রূপ ভাবেই হইয়া থাকে। মায়ের নাভী রজ্জু-বেষ্টিত হইয়া যেমন জাতক ভূমিষ্ঠ হয়, দৈহিক তাড়িৎ-তন্তুদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তদ্রূপভাবে আতিবাহিক দেহেরও জন্ম হইয়া থাকে। যখন ঐ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলটীর গঠনকার্য্য চলিতে থাকে, সেই সময় উক্ত মস্তক নিঃসৃত কিরণমালার ভিতর একটি দ্রুত কম্পন উত্থিত হয়। জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলটী যত ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই সেই কম্পন মন্দীভূত হয়। সেই জ্যোতিঃরাশির উপাদানগুলি, যাহা মৃত্যুঘটনার আদি অবস্থা হইতে শরীরের অপরাপর অংশ সমাকৃষ্ট হইয়া মস্তিষ্কে সমবেত হয় এবং যে সকল সূক্ষ্ম উপাদান হইতে এই তেজঃপুঞ্জের উৎপত্তি হয়, তাহা সার্ব্বভৌম সংমিশ্রণ-শক্তির বলে ব্রহ্মতেজের সহিত অবিযোজ্যভাবে সংমিলিত আছে। এবং যে শক্তির বলে নিখিল-বিশ্বের পরমাণুসমূহ পরিচালিত সেই শক্তির বশবর্ত্তী হইয়াই ঐ শারীরিকতত্ত্ব বা উপাদানপুঞ্জ উপরোক্ত ছায়ামণ্ডল গঠন করে।

একই শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ঠিক একইভাবে সেই একই-রূপে জ্যোতিষ্মান্ উপাদানে মৃতশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুকরণ করিয়া অবিকল তদনুরূপ একটি সর্ব্বাঙ্গীন ছায়া বা সূক্ষ্মদেহ গঠিত হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মানবের আধ্যাত্মিক সত্ত্বা যে উপাদানে গঠিত, তাহার পরমাণুর সমষ্টির ভিতরও তদনুরূপ একটি অন্তরঙ্গতা বিদ্যমান আছে। তাহাদের পরস্পরের ভিতর এমন অভেদ্য মিলনের আকাঙ্খা বর্ত্তমান আছে, যাহার বলে আধ্যাত্মিক

পরমাণু ঠিক জড় পরমাণুর মত ধর্ম্মবিশিষ্ট না হইলেও মৃত্যুর পর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া একটি আতিবাহিক সূক্ষ্মদেহ গঠন করিতে সমর্থ হয়। স্থূলশরীরে যদি কোন অঙ্গ বৈকল্যদোষ দৃষ্ট হয়, তবে সেই আতিবাহিকদেহে তদনুরূপ কোনও দোষ থাকে না। এই নিমিত্ত সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে আত্মা অবাধে এবং অসঙ্কচে নিয়ত উন্নতির পথে ধাবমান হইতে সক্ষম হয়।

মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা।

সূক্ষ্মদেহটীর গঠন কার্য্য শেষ হইলে জীবাত্মা জ্যোতির্ম্ময়-দেহ ধারণপূর্ব্বক শবদেহের মস্তকের উপর দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু এতদিনের ভালবাসা নিবিড় সম্বন্ধ যাহার সঙ্গে, ত্বচে ত্বচে অণুতে পরমাণুতে জড়িত ছিল—সেই ধূল্লবলুণ্ঠিত জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালময় এতদিনের শত সোহাগের বন্ধু দেহখানাকে ছাড়িয়া জীহাত্মা এই অভিনব দিব্যবপু ধারণ করিয়া সুদূরের সুখময় কুঞ্জ-কুটীরে যাইতেও যেন "আধ পা যায় প্রিয়া ফিরি ফিরি চায়" এমনটীভাবে অতি-সন্তর্পনে তাহার বিলাসের পুরাতন ত্যক্ত কুটীরখানি ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না। আতিবাহিকদেহের আকাশস্থ চরণের সঙ্গে আর শব-দেহের মস্তকের সঙ্গে একটী তাড়িতশক্তি তখন পর্য্যন্তও খেলিতে থাকে। তখন পর্য্যন্তও এই তাড়িৎ-রজ্জু উভয়ের বন্ধন অচ্ছেদ্য রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে।

জীব নাভী-রজ্জু গলায় পড়িয়া যেরূপে মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, মরণের পর অতিন্দ্রিয়রাজ্যেও ঠীক তদ্রূপ সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়-রজ্জু বেষ্টিত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে জন্মগ্রহণ করে। ইহাতেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাহাকে আমরা মরণ বলি, তাহা একটী নবজন্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সূক্ষ্ম তাড়িৎ-তন্তু কিছু সময়ের জন্য মৃতদেহ এবং আতিবাহিকদেহকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখে। এই নিমিত্তই মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অগ্নিসংকার বা কবরাদি দিবার ব্যবস্থা নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রজ্জু ছিন্ন হইয়া না যাইবে, ততক্ষণের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু হয় নাই, ঐ অবস্থা হইতে সে এই দেহে পুনঃ প্রবৃষ্ট হইতেও পারে। এমন দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখিয়া থাকি। সূক্ষ্মশরীরের এই নাভী-রজ্জু অবস্থাভেদে অল্প অথবা দীর্ঘকাল সময় স্থায়ী হয়। উহা দ্বারা উভয় শরীরের ভিতর পরস্পর অনুভূতি ও অভিজ্ঞানের আদানপ্রদান চলিতে থাকে। সমাধি (Calalepsy) যোগনিদ্রা (Clairvoyance) প্রভৃতি যোগাত্মক ব্যাপারে অপরক্ষ বা অতিন্দ্রিয় বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতে পারে। এই জন্য মর্ত্তভূমিতে গিরি-গুহায় অবস্থান করিয়াও ভারতীয় আর্য-ঋষিগণ সপ্তর্ষিমণ্ডলের আভ্যন্তরীণঅবস্থার বিষয় অবগত হইয়া, চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রহ-উপগ্রহে লোকলোকান্তরে বিচরণ করিয়া আমাদের বাহ্যচক্ষুর অতীত অসংখ্য অজ্ঞেয় তত্ত্ব অনেক কল্পনাতীত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কাহিনী আমাদের শাস্ত্রে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যে সূক্ষ্ম-নাভী-রজ্জু লইয়া আতিবাহিক দেহের জন্ম হয়, তদ্দ্বারা মানব বিশ্ব-জননীর অমৃতময়ী জীবনীধারা

পান করিতে সমর্থ হয়। এবং সেই নাভীর ক্ষুদ্রবিবরের মধ্য দিয়াই মানব প্রকৃতির রহস্যময় কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়া থাকে।

আত্মা সম্পূর্ণরূপে স্থূলদেহের পাশ কাটাইয়া বিচ্ছিন্ন হইলে তদীয় সূক্ষ্মদেহ নিরাশ্রয় ও নিরাবলম্ব হইয়া বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে, স্থূলশরীরের অভাবহেতু আত্মা সূক্ষ্মবায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত হঠাৎ আত্মা একটি নূতন অবস্থায় পড়িয়া উক্ত সূক্ষ্মবায়ু গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ একটু বেগ পাইয়া থাকে। কিন্তু দুই এক মুহূর্ত্ত পরেই উক্ত অসুবিধাটুকু কাটিয়া যায় এবং স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস লইতে পারে। মৃত্যুতে আত্মার এই পরিবর্ত্তনে দেহীর আমিত্বের এককালীন ধ্বংস বা বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। পরন্তু সেই আতিবাহিকদেহ স্বভাব-সৌন্দর্য্যে এই আধি-ব্যধির আধার স্বরূপ জড়দেহ হইতে সকল অংশেই প্রীতির লক্ষণে লক্ষিত হইবে।

মৃত্যুতে মানুষের অহংজ্ঞানের বা আমিত্বজ্ঞানের বিনাশ হয় না। তখনও মানুষ ঠিক বুঝিতে পারে যে, যে-আমি পৃথিবীতে স্থূলশরীরে ছিলাম, সেই আমিই সূক্ষ্মশরীরে—অতিন্দ্রিয়রাজ্যে আসিয়াছি মাত্র। মৃত্যুর পূর্ব্বে মৃতের আত্মীয়-স্বজন, যাহারা তাহার জন্য এতদিন কাঁদিয়া আকুল ছিল, তাহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিলে মৃতব্যক্তিও দেখিতে পাইবে যে, আমিও তাহাদের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়দেহে অবস্থান করিতেছি। সূক্ষ্মদেহটীর গঠনকার্য্য সম্পূর্ণ শেষ হইয়া উপর্য্যুক্ত তাড়িৎতন্তু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আত্মা শূন্য হইতে নিম্নে অবতরণ করে। এই সময় তাহার কর্ম্মফল ভোগানুকূল স্থানের কতিপয় 'আতিবাহিক স্পিরিট বা সূক্ষ্মদেহী

তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হয় এবং আত্মা অতি ধীরপদসঞ্চালনে তাহাদের সঙ্গে স্বীয় কর্ম্মফল ভোগানুকূল স্থানে গমন করে। কর্ম্মফলের তারতম্যানুসারে আত্মা বিভিন্নলোক প্রাপ্ত হন, আর কেহবা সংস্কারসূত্রে গ্রথিত হইয়া অন্ধের ন্যায় প্রেতলোকে বিচরণ করিতে থাকে।

গতিপথ।

মৃত্যুর পর আত্মার সাধারণতঃ দুই পথে গতি হয়। এক দেবযান বা শুক্ললোক অপর পিতৃযান বা ধূম্রলোক। আর যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের ব্রাহ্মীভাব। তাঁহাদের সমস্তই "অত্রৈব সমবলীয়তে।" ব্যষ্টিভাবে জন্মমৃত্যুর লীলার অবসান হয় এবং অধিষ্ঠানতত্ত্বরূপে জাগ্রত হইয়া অনন্তকালবাহী জন্ম-মৃত্যুর বীচিমালা বক্ষে ধারণ করতঃ প্রশান্ত সাগরের ন্যায় অচল প্রতিষ্ঠায় স্ব-মহিমায় বিরাজিত থাকেন। ইহাই নির্ব্বাণমুক্তি বা জীবের পরমপুরুষার্থ শ্রুতিতে উক্ত আছে, [পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা পরাগতিঃ] অর্থাৎ সেই পুরুষ অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনিই স্থিতি স্থান, তিনিই পরমগতি। অন্যথা সকলেরই পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই বৈদান্তিক শাস্ত্রসম্মত মত।

শ্রুতিতে উক্ত আছে, অগ্নি এবং জ্যোতিঃ তেজের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা, শুক্লপক্ষাধিষ্ঠাত্রীদেবতা এবং উত্তরায়ণাধিষ্ঠাত্রীদেবতা এবং বেদোক্ত দেবলোকাদি দেবতাগণের উপলক্ষিতমার্গে গমনকারী সগুণ-

ব্রহ্মবিদ্গন সগুণ-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, আর নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণ জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত হন। তাঁহাদের কদাচ এরূপ গতাগতি হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।১—২) উক্ত হইয়াছে যে, "যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাবান ও তপস্বী হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহারা মরণান্তে প্রথমে তেজের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাকে প্রাপ্ত হন, অনন্তর ক্রমশঃ দিবসাধিষ্ঠাত্রীদেবতা, আপূর্য্যমানপক্ষ অর্থাৎ শুক্লপক্ষ-দেবতা, চন্দ্র, সূর্য্য এবং বিদ্যুতাধিষ্ঠাত্রীদেবতাদিগকে প্রাপ্ত হন। তথায় কোন মানব উপনীত হইলে তাহাকে কোনও অ-মানব পুরুষ (দিব্যপুরুষ) ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া তাঁহাকে তথায় লইয়া যান, ইহাই দেবযান পথ ; আর সকাম কর্ম্মযোগীগণ মরণান্তে ধূম্র, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ণ ষণ্মাস প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রীদেবতাগণের উপলক্ষিত মার্গে গমন করিতে করিতে ক্রমে স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হন এবং আপনকৃত সুকৃতের ফল ভোগ করেন। পুনঃ পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্তলোকে পুনরাগমন করেন। যথা—

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম।
তত্র চান্দ্রমাসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥

গীতা ৮।২৬

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।৩—৫) উক্ত আছে "যাঁহারা গ্রামে গৃহস্থভাবে থাকিয়া ইষ্ট (যাগাদি) পূর্ত্ত (জলাশয়প্রতিষ্ঠা, মার্গাদিনির্ম্মাণ এবং দানাদি কর্ম্ম) কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মরণান্তে প্রথমতঃ ধূমাভিমানিনীদেবতা, ক্রমশঃ রাত্রিদেবতা, কৃষ্ণপক্ষ -দেবতা, দক্ষিণায়ণ দেবতা, পিতৃলোক, আকাশাধিষ্ঠাত্রীদেবতা এবং

চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। সোম দেবতাগণের অন্ন। তথায় কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত বাস করিয়া কালদ্বারা চালিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও মর্ত্ত্যলোকে প্রতিনিবৃত্ত হন।" ভাগবতে তাহাই বলিতেছে :—

"ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ। ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্॥ স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে, বিমান্ উপগীয়তে। গন্ধর্ব্বৈর্বিহরণ্ মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেশধৃক্॥ স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা। ক্রীড়ন্ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষুনিবৃতঃ॥ তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎপুণ্যং সমাপ্যতে। ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনির্চ্ছন্ কালাচালিত॥

(ভাগবত ১১।১০।২৩—২৬)।

আর যাঁহারা মধ্যমঅধিকারী তাঁহারা দেবযানে ক্রমোন্নতির পথে শুক্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি নাই। উত্তম অধিকারীর ব্রাহ্মীভাব আর নিম্নঅধিকারীর ধূম্রলোক বা পিতৃযান পথে গতি হয় এবং তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি আছে। যথা—

শুক্লে কৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ (গীতা)।

যাঁহারা দেবযানপথে উত্তরাভিমুখীন হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদের শ্বাসবায়ু দক্ষিণ নাসা রন্ধ্র হইতে বহির্গত হয়। যথা,—

দক্ষিণা পিঙ্গলা নাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা।
দেবযানমিতি জ্ঞেয়া পুনঃ কর্ম্মানুসারিণী॥

(গীতা ৮।২৬)

আর যাঁহাদের পাপ-পুণ্যসমবল, তাঁহাদের শ্বাসবায়ু বাম-নাসারন্ধ্র হইতে গমন করে। যথা,—

ইড়া চ বাম নিশ্বাসঃ সোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযানমিতিজ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতী॥

ইহাদের কিছুকাল ভোগশরীরে প্রেতলোকে অবস্থান করিয়া নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পরে মৃতের আত্মীয়-স্বজন মৃতের তৃপ্ত্যর্থে যে শ্রাদ্ধ-তর্পনাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহার কামনা-ময়দেহের যন্ত্রণার উপশম হয়।

প্রেতলোকের ভোগ।

মৃত্যুর পর মানবের আত্মা 'দশপিণ্ড' পাইয়া প্রেত-দেহলাভ করে। প্রেত-দেহপ্রাপ্ত জীব যমালয়ে নীত হয়। ষোড়শপ্রেতশ্রাদ্ধ অর্থাৎ আন্তশ্রাদ্ধ হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত হইলে জীবাত্মা ভোগ-দেহ প্রাপ্ত হয়। এই ভোগদেহেই জীবাত্মার যমদর্শন ঘটে, এই ভোগদেহ দ্বারাই যমের নির্দ্দেশানুসারে জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মফল অনুরূপ স্বর্গ-নরকাদিতে গমন করিয়া বিবিধ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। যথা,—

"বান্ধবানামশৌচেতু দেহে খল্বাতিবাহিকে তিষ্ঠন্ নয়তি কর্ম্মজ্ঞ দত্ত পিণ্ডাসনং ততঃ। তং ত্যক্ত্বা প্রেতদেহস্তু প্রাপ্যান্যাং প্রেতলোকতঃ বসেৎ ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত আমশ্রাদ্ধান্ন-ভুঙ্ নরঃ॥ আতি-

বাহিক দেহাৎতু প্রেতপিণ্ডাংর্বিনা নরঃ ন হি মোক্ষমবাপ্নোতি পিণ্ডাগুংসোহশ্নৃতে। কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্॥ প্রেতদেহং সমুৎসৃজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে। ভোগদেহাবুভৌ-প্রোক্তাবশুভাশুভ সংজ্ঞিতৌ। ভুক্ত্বাতু ভোগদেহেন কর্ম্মবন্ধাগ্নি-পত্যতে॥" (অগ্নিপুরাণ ৩৬৯ অধ্যায়)।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরলোকগত আত্মার তৃপ্তার্থে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে যে সকল কর্ম্ম করা হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধাদির সময় সর্ব্বতোভাবে যথাসম্ভব পবিত্রতা রক্ষা এবং মন্ত্রাদি বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধীয় মন্ত্রের শব্দ-তরঙ্গে মৃতের কামনাময়-দেহ ভাঙ্গিয়া যায়। স্থূলদেহে আরও সাতটী সূক্ষ্ম আবরণ আছে; যথাক্রমে সপ্তলোক অতিক্রমনের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি আবরণ উন্মোচিত হয়।

স্বর্লোকের ভোগ।

মানবের চিন্তাধারা দুইপ্রকার:—সূক্ষ্ম ও স্থূল। স্থূল হইলেই তাহা মূর্ত্ত, আর সূক্ষ্ম হইলেই তাহা অমূর্ত্ত। এই দুই ধারাকে হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণতঃ পিতৃযান ও দেবযান বলিয়াছেন। মানব চিন্তাশীল জীব, জাগ্রত স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই তাহার মন কোন না কোন বিষয়ের চিন্তা লইয়া ব্যস্ত থাকে। যখনই সে কোন বিষয়ের চিন্তা করে, তখনই সে কোন এক মনোময়রাজ্যে গমন করিয়া থাকে এবং মনের ধারণার বিষয় সাধারণতঃ মূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল বিষয়ের

মনোময় ফটো দেখিয়া থাকে। মৃত্যুর পর জীবাত্মা তাহার মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমবায়ে গঠিত সূক্ষ্মদেহ লইয়া স্থূল অন্নময় দেহ হইতে বহির্গত হয়। প্রেতত্ব অতিবাহনের পর মৃতব্যক্তির মনোময় শরীর যে উপাদানে গঠিত (affinity দ্বারা) তদ্রূপ উপাদানে গঠিতলোকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব মৃত্যুর পর স্বীয় সুকৃতির ফলে এই স্থানে গমন করিয়া কামনার বিষয়াদি ভোগ করে। পৃথিবীতে অবস্থানকালে যাহার চিত্ত যে বিষয়ে লিপ্ত থাকে অর্থাৎ যে যে-বিষয়সমূহ চিন্তা করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, যে যে-চিন্তা মনোময়-ফটোরূপে অন্তরে রাখিয়া তাহার ধ্যান-সুখে তৃপ্ত থাকে, মৃত্যুর পর স্থূল অন্নময় কোষদ্বারা মনোময়কোষ অবরুদ্ধ না থাকায়, এবং একই উপাদানে গঠিতলোকে অবস্থান করায় তাহার পূর্ব্ব-চিন্তার অনুরূপ বিষয়সমূহ স্পষ্ট হইয়া তাহার দিকট দেখা দেয়। কেন না, সংকল্পসিদ্ধিত্বই স্বর্লোকের ধর্ম্ম। তাই স্বর্লোক সুখপ্রদ স্থান। জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-দুঃখ জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারেই ভোগ করিয়া থাকে। গুণ অনুসারে জীবের কর্ম্ম এবং কর্ম্ম অনুসারে ত্রিলোকে গতাগতি হয়। যথা "ত্রিলোক্যাংগতয়ঃ সর্ব্বাঃ কর্ম্মাণাং ত্রিগুণাত্মণাম্"

হিন্দু-ধর্ম্মের গতি শুধু স্বর্গ পর্য্যন্ত যাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সপ্তম স্বর্গের উপরেও তাহারা নিত্য শান্তিপ্রদ স্থানের নির্দ্দেশ করেন। যাঁহারা আত্মচিন্তাদ্বারা সমস্ত জগৎকে এক অখণ্ডভাবে চিন্তা করিবার শক্তি আয়ত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অমূর্ত্তে বা অরূপে পৌঁছিয়াছে। তাঁহারা সর্ব্বদাই দ্বন্দ্বাতীত (abstract) চিন্তা লইয়াই ভূলোকে ব্যপৃত থাকায় মৃত্যুর পর

অদ্বৈতজ্ঞান হইতে লভ্য যে আনন্দ, সেই আনন্দে আনন্দময় অবস্থায় অবস্থান করেন। আর সকাম কর্ম্মযোগীরাই ফলকামনা হেতু স্বর্লোকাদি ভোগ্যলোকে গমন করিয়া সুখ সম্ভোগাদি উপভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের কর্ম্ম স্বর্গাদি-সুখ-কামনা-মূলক, তাঁহারা সুকৃতের ফল স্বর্গাদিতে পরিমিতকাল সম্ভোগ করিতে পারেন মাত্র ; পরে পুণ্যক্ষয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বর্গ হইতে পতিত হন। যথা—

তাবৎপ্রমদতে স্বর্গে যাবৎপুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥

(ভাগবত ১১।১৩।২৬)

সুতরাং অনাবিল সুখ মুক্তি ভিন্ন অন্য আর কোথায়ও নাই। স্বর্গাদিতেও হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা দোষ দৃষ্ট হয়। শিবসংহিতায় উল্লিখিত আছে :—

স্বর্গেঽপি দুঃখ সম্ভোগ পরস্ত্রী দর্শনাদিষু।
ততো দুঃখমিদং সর্ব্বং ভবেন্নাস্ত্যত্রসংশয়ঃ॥

(শিবসংহিতা ১ম পটল)

সুতরাং নিবৃত্তি ভিন্ন শান্তি কোথায় ? এক শ্রেণীর সাধক মনে করিয়া থাকেন, যাগ-যজ্ঞ ও পশু-বলিতেই বুঝি ধর্ম্ম হয়, স্বর্গদ্বারের অর্গল মুক্ত হয়। কিন্তু ত্যাগীবরশুকদেব বলিয়াছেন,—

যুপং কৃত্বা পশুং কৃত্বা কৃত্বারুধির কর্দ্দমম্।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে॥

(যোগপনিষদ)

যূপকাষ্ঠে পশু-বলি দ্বারা রুধিরের কর্দ্দম করিলেই যদি স্বর্গে যাইবে, তবে নরকে যাইবে কে? কেহবা মনে করেন পুত্র হইলেই পুত্রদ্বারা স্বর্গলাভের উপায় হইবে; দত্তাত্রেয় বলেন—"সা মুক্তি শুনি শূকরস্য চ।" "স্বকর্ম্মফলভুক্‌পুমান্‌" এ কথা আমাদের ভাবিয়াকাজ করা উচিত।

নরকাদির বর্ণনা।

অবীচির (নরক) উপর্য্যুপরি ছয়টী মহানরক ভূমি রহিয়াছে। তাহারা যথাক্রমে পৃথিবী, সলিল, অনল, অনিল, আকাশ ও তমে প্রতিষ্ঠিত। পুরাণে তাহাদের নামও উক্ত আছে ঃ—মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরভ, মহারৌরভ, কালসূত্র ও অন্ধতামিশ্র; প্রকৃতির এই অতি নিম্নস্তরে উক্ত নরকাদিতে নারকীয়গণ যে কি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, তাহা অনুমান করিতেও বিশ্বব্যাপক মনঃশক্তি হীনশক্তি হইয়া পড়ে। পুরাণাদি শাস্ত্রে যেরূপভাবে নারকীয় দুঃখ-ভোগের বিষয় বর্ণিত আছে তাহা অতিশয় মর্ম্মান্তক। শাস্ত্রে আছে ঃ— "তত্রাগ্নিনা সুতীব্রেন তাপিতাঙ্গারভূমিনা। তন্মধ্যে পাপ-কর্ম্মাণাং বিমুঞ্চন্তি যমানুগাঃ। ইত্যাদি—

অর্থাৎ কোথায়ও পাপীগণ ভীষণ জাজ্বল্যমান অনলে দহ্যমান কোথায়ও নিম্নদিকে মস্তক, উদ্ধদিকে পদবিলম্বিত অবস্থায়, কোথায়ওবা রক্তবমন ইত্যাদি অসহনীয় যন্ত্রণারাশি ভোগ করিতে করিতে হা মাতঃ! হা তাতঃ!! হা ভ্রাতঃ!!! এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া থাকে।

ইস্‌লামধর্ম্মের মতানুসারে নরককে অবাধ্য ও পাপীলোক-দিগের চরিত্র-সংশোধনের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নরকের শাস্তি অতি কঠোর। প্রত্যেক মানবকেই নানারূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আত্মার উন্নতি করিবার জন্য বহুবিধ প্রলোভনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবার স্বাধিনতা দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই সমস্ত প্রলোভনের মায়ায় পড়িয়া মূঢ়ের ন্যায় আত্মসংযমের কথা বিস্মৃত হয়, তাহাদের আত্মা উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে মলিন হইয়া পড়ে। মনের মলিনতা দূর করিবার জন্যই জীব নরক-বহ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়। *আমাদের নয়নপথবর্ত্তী চিত্তবিমোহন ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে অনন্ত কোটি সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড শোভা পাইতেছে। আধুনিক জড়বিজ্ঞান ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারে না। বিজ্ঞান দৃশ্য-পদার্থেরই তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়। এই সমূদয় লোক ত্রিগুণময় প্রাকৃতিক রাজ্যের অন্তর্গত হওয়ায় তৎসমূদয় উর্দ্ধে এবং অধেঃ অবস্থিত। সত্ত্ব এবং তমগুণের বিকাশের তারতম্য অনুসারে উহা ঐরূপ হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর থাকিয়া ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যে সকল জীবের উক্ত লোকসমূহে গতি হইবে, তাহাদের প্রাক্তন সংস্কারও তদনুরূপ সাত্ত্বিক বা তাম-সিক ভাবাপন্ন হইবে। এবং ঐ সংস্কার অনুসারেই উহারা যথাযোগ্য ভোগ্যপ্রাপ্ত হইবে। অন্তরপ্রকৃতি যাহার যেরূপ বহিঃপ্রকৃতিও তাহার তদনুরূপ হইবে। অর্থাৎ সে স্বভাবতঃই সেখানে আকৃষ্ট হইয়া যাইবে। জগতের সর্ব্বত্রই এই একই নিয়ম।

*মৌলবী মহম্মদআলীর পবিত্র কোরাণের ইংরাজী অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত ৫৭।১৫।

প্রকৃতি যতই ঊর্দ্ধগামিনী হন, প্রকৃতির স্তরে স্তরে যতই সূক্ষ্মতা বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, ব্যাপক আনন্দরূপ পরমাত্মার বিকাশও ততই অধিক হইতে অধিকতর ব্যাপকতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। আবার প্রকৃতিমাতার যতই নিম্নস্তরে যাইবেন, ততই দেখিতে পাইবেন, ক্রমে ক্রমে গাঢ় তমিস্রা, দুঃখেরভীষণ তাড়ণা। প্রকৃতির এই অঙ্গই, এই দুঃখময়স্তরই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। এই চির অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠই আর্য্যশাস্ত্রে **নরক** বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতির এই অংশটুকু অতি নিম্নস্তর বলিয়া ঘোর তমময়। এই নিমিত্তই সেখানে আনন্দ অন্ধকারাচ্ছন্ন, রজঃসত্ত্ব-সৌদামিনী তথায় আপন লীলা বিস্তার করে না। কেবল সেখানে তমোবারিদমালাই সর্ব্বদা চন্দ্রাতপরূপে বিরাজ করিতেছে। এই জন্যই নারকীয় জীবন নিবিড় দুঃখময় হইয়া থাকে। আনন্দসত্ত্বা সর্ব্বব্যাপিনী হইলেও ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিভাবে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, এই গুণত্রয়ের বিকাশের তারতম্য হেতু আনন্দসত্ত্বারও বিকাশের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যষ্টিপ্রকৃতিতে রজস্তমোমল অপঃস্হত হইয়া সত্ত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের অভিব্যক্তি এবং সত্ত্বের পূর্ণতা ও পরিশেষে লীনতার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরূপ ভগবদ্ভাবেরও পূর্ণ বিকাশ সম্পাদিত হইয়া থাকে। উক্ত বিচারের উপর প্রনিধান করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে যে প্রকৃতির উচ্চাবচস্তরভেদ অনুসারেও ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ ও অধঃলোকেও আনন্দ-সত্ত্বার বিকাশের তারতম্য নিশ্চয়ই হইবে।

কর্ম্মফল।

জীব যে যে বিষয়ে ভাবনা প্রযত্নাদি করিয়া থাকে, তাহার সূক্ষ্ম চিত্রগুলি গুপ্তভাবে চিত্তাকাশে সংস্কাররূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে; ইহাই চিত্রগুপ্তের খাতা। ঐ চিত্রগুলি চিত্তে যেমন ভাবে অঙ্কিত থাকে, বাহিরেও তেমন ভাবে ঐ চিত্রগুলি আকাশ-পটে অনন্তকালের জন্য অঙ্কিত রহিয়া যায়। থিওছোফিষ্টগণ উক্ত চিত্রাবলীকে "Akasic records" বলেন। যাঁহারা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন, তাঁহারা ঐ চিত্রাবলী দেখিতে পান। ধর্ম্মরাজ ঐ চিত্রাবলীর অধিনায়ক, তাই তিনি জীবের নিয়ন্তা। দশদিকপাল, একাদশরুদ্র এবং পিতৃলোকের অর্জ্জমা প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডের অতি উচ্চঃস্তরের দেবতাগণ দ্বারা উক্ত চিত্রাবলী রক্ষিত হইয়া জীবের ভাগ্যলিপি গঠিত হয়। প্রাচীন গ্রন্থে ঐ চিত্রাবলীর রক্ষকদিগকে 'লিপীক' বলা হইয়াছে। আত্মা বাসনা-পরিপূরণের জন্য দেহ-ধারণ করিয়া থাকে। জন্মের প্রারম্ভে দেহের যে সূক্ষ্ম উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া আত্মা এই জড়দেহের বীজ সৃষ্টি করেন, তাহাই ভূতসূক্ষ্ম। আবার এই জড়দেহের প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই মাত্রানুযায়ী ভূত-সূক্ষ্ম বা তন্মাত্রাকে আশ্রয় করিয়া আত্মা এই স্থূলদেহ ছাড়িয়া যান। অতএব ভূতসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ জীবিতাবস্থায়ও যেমন মৃত্যুর পরও ঠিক তদ্রূপই থাকে; এইগুলি আত্মার কর্ম্মাশয়।

রৌদ্র-কিরণস্নাত শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি যেমন আকাশ-পটে কখনও দৃশ্য কখনও অদৃশ্য অবস্থায় থাকে, চিত্তাকাশেও ঠিক তদ্রূপ ভাবেই কর্ম্মের সংস্কার গুলি অবস্থান করিতেছে। জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থায় কখনও কখনও তাহা ভাসিযা উঠিতেছে। এই কর্ম্ম-সংস্কারই চিত্রগুপ্তের পাণ্ডুলিপি।

মানব ত' সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিয়া চলিতেছে, জীবনের প্রায় সকল চিত্রই সে জগতের কাছে গোপন রাখিতে চাহে, বাহিরে গোপন থাকিলেও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আপন অন্তরের কাছে সমস্তই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। মরণকালে জড়ের বাঁধন শিথিল হইয়া পড়িলেই দৃষ্টিশক্তির এমন তীব্রতা জন্মে যে, তাহাতে আজীবন যে ঘটনার স্রোত বহিয়া আসিয়াছে, তাহার একটা প্রতিলিপি জীবের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে। এবং কর্ম্মবিধাতৃগণ উহা দেখাইয়া গোপনে বলিয়া যান, "এই তোমার কর্ম্ম—সারাজীবনের সঞ্চিত কর্ম্মগুলি দেখিয়া লও, তারপর তোমার অদৃষ্টই তোমার ভবিষ্যতের নিয়ামক হইবে।"

আমরা নিদ্রিতাবস্থায় অবশ্যই নানারূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। আমি আমার সুগঠীত পর্য্যঙ্কের উপর রক্ত-মাংসের স্থূলদেহটী সংস্থাপিত করিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছি। কিন্তু আমি দেখিতেছি যেন, আমি আমার সঙ্গীগণসহ কোনও এক ভীষণ অরণ্য-পথে যাইতেছি, এমন সময় সেই বনমধ্য হইতে এক ভীষণাকার ব্যাঘ্র আসিয়া আমাকে আক্রমন করিল, আমার সঙ্গীগণ প্রাণভয়ে ইতঃস্তত ছুটিয়া পলায়ন করিল; আর আমি একাকী

ব্যাঘ্রের আক্রমন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণে উর্দ্ধঃশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলাম, ব্যাঘ্র পশ্চাৎদিক হইতে আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার মনে আক্ষেপ হইতে লাগিল,—হায়! বন্ধুবান্ধব কাহারও সহিত আমার আর দেখা হইল না,—ব্যাঘ্রের করাল-কবলে প্রাণ হারাইলাম! ব্যাঘ্রের নখ-দন্তাঘাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া দর্ দর্ রুধিরধারা বহিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্যাঘ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমার ঘনশ্বাস বহিতেছে বটে, কিন্তু কোথায় ব্যাঘ্র? কোথায় লোকজন? কোথায় অরণ্য, আর কোথায়ই বা আমার সেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত কলেবর? আমি অক্ষতশরীরে পূর্ব্ববৎ সুখ-শয্যাতেই শায়িত রহিয়াছি; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় যে ভীষণ যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি, বা আমার অন্তরাত্মা ভোগ করিয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি ত' এই স্থূলদেহ লইয়া কোথায়ও যাই নাই? আমার দেহ ত' শয্যাতেই শায়িত ছিল! তবে এই ভয়াবহ যাতনা ভোগ, এই স্থূলদেহ ছাড়া অন্য দেহাত্মকজ্ঞান ও ক্রিয়া কোথা হইতে আসিল? এই জ্ঞান বাহ্যজগতের প্রতি অলিক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আমার আভ্যন্তরিক জগতে ভোগ-সময়ে উহা আমার পক্ষে অবশ্যই ধ্রুব সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অপর পক্ষে যদি স্বপ্নে দেখি, আমি দিব্যকুসুমোদ্যানে মনোরম প্রাসাদে দিব্যাঙ্গনাগণের মনোরম নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া নিতান্ত পুলোকিত হইতেছি। সুবাসিত সমীরণ আমাকে

সুগন্ধদান করিতেছে, যাবতীয় গন্ধর্ব্ব ও দেবতাবৃন্দ আমার প্রতি প্রিয় সম্ভাষণ করিতেছেন। আমি এই আনন্দধামেই চিরজীবন রহিব, আর মর্ত্ত্যধামের দুঃখ-জ্বালায় জ্বলিতে যাইব না। মনে মনে এইরূপ কত কি ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন কোথায় গেল সেই মৃদুহাসিনী মধুরভাষিণীগণ, আর কোথায় গেল সেই সুধাসঞ্চারী সুললিতকণ্ঠের সঙ্গীত কাকলি! আমি আমার পর্ণকুটীরেই শায়িত রহিয়াছি; তবে এরূপ নৃত্যগীতাদি দর্শনশ্রবণাদি ব্যাপারে আমার দেহাত্মকজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? আর অভূতপূর্ব্ব আনন্দ যে আমি বা আমার আত্মা উপভোগ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। বাহ্য-জগতে ইহা অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মনোময়জগতে আমার ভোগসময়ে উহা অবশ্যই সত্য। স্থূলদেহের অভাবে আমার সূক্ষ্মদেহের এতাদৃশ সুখ-দুঃখাদি ভোগ কোনক্রমেই অলীক বলা যাইতে পারে না। তাই পাশ্চাত্য-কবি সেক্সপিওর (Shakes-pear) বলিয়াছেন :—To die is to sleep ; but chance to dream." "মৃত্যু" সে ত' নিদ্রা, কিন্তু স্বপ্নেরই ত' আশঙ্কা।

নিদ্রায় যদি স্থূলদেহের পরিচালনা ব্যতিরেকে আত্মার দেহধারীর ন্যায় সুখ-দুঃখাদি ভোগ সম্ভবপর হয় তবে জীব যখন মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইবে, তখন স্থূলদেহের ক্রিয়া ব্যতিরেকে আত্মার সুখ-দুঃখাদি অনুভব অসম্ভব হইবে কেন? সুতরাং জীবিতাবস্থায় জীব যেমন কর্ম্ম করে, এবং তাহার ফলভোগ করে, মৃত্যুরপরও তেমনি সে তাহার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়।

জন্মান্তরবাদ।

জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্ম্মের মূলভিত্তি। এই জন্মান্তরে বিশ্বাস আছে বলিয়াই সনাতন-ধর্ম্মাশ্রয়ী আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও পরহিতকর কার্য্যে ব্রতী হয়। সতী পতিপ্রেম বুকে বহিয়া পরজন্মে মিলনের আশায় স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সাধারণ মানব-মনে সততই সংশয় উপস্থিত হয়, জন্মান্তর কি সত্য মত? ইহার কি কোন প্রমাণ আছে? এইরূপ কত প্রশ্নই মানব-মনে উদিত হইয়া মানবকে এই জনন-মরণ-প্রহেলিকায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কোন বস্তু প্রমাণ করিতে হইলে আমরা তিন প্রকারে তাহা প্রমাণিত করিতে পারি। প্রথমতঃ নিজে বস্তুটী প্রত্যক্ষ করিয়া, দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা অনুমান করিয়া এবং তৃতীয়তঃ শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা।

যাহা আমাদের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ; আর সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে আমরা যাহার সত্যতা প্রমাণিত করিতে পারি তাহাই অনুমানসিদ্ধ এবং ভগবদ্বাক্য কিংবা-ব্রহ্মবেত্তা-তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের উপদেশই আপ্তবাক্য। আপ্তবাক্য বা শাস্ত্রবাক্যই প্রমাণ্য। প্রতীচ্য দর্শনে জন্মান্তর স্বপক্ষে প্রমাণের অন্ত নাই। পাশ্চাত্য দর্শন যাহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাও দেখিয়াছেন, জন্মান্তর সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষিরাও উদার বৈদান্তিক

মতেরই পক্ষপাতী। হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় ইস্‌লামে জন্মান্তরবাদ স্বীকার না করিলেও পরলোক সম্বন্ধে এই ধর্ম্মের মত অন্য কোন ধর্ম্মমতের অপেক্ষা কম যুক্তিপূর্ণ নহে। আরবী ইস্‌লাম শব্দের অর্থ শান্তির মধ্যে প্রবেশ। মৌলবী মহম্মদআলীর (লাহোর) পবিত্র কুর্‌আন-শরিপের ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে। "আত্মার অবস্থিতির জন্য এবং তাহার ক্রিয়াকলাপের জন্য দুইটী ক্ষেত্র আছে, ইহলোক ও পরলোক। প্রথমটী হইতে দ্বিতীয়টীতে যাইবার জন্য যে দ্বার অতিক্রম করিতে হয় তাহাই মৃত্যু; সুতরাং মৃত্যু শুধু স্থানভেদে আত্মার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়। ইস্‌লাম-ধর্ম্মের মতে ইহজীবন এবং পরজীবন দুইটী পৃথক্ জীবন নহে; বরং একটি অপরটীর অনুক্রম মাত্র। এই ধর্ম্মমতে মানবাত্মার পুনরুত্থানের (Resurrection) পর যে মহাবিচার (Judgment) হইবে, তাহা ইহলোকেরই কৃতকর্ম্মের বিচার। প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন, "ইহজীবন কৃষিক্ষেত্র, পরজীবনে ইহারই ফল লাভ ঘটিবে।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই উভয় লোকের মধ্যে একটি মাত্র অভিন্ন জীবনের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

বৌদ্ধ-দর্শনেও জন্মান্তরবাদ স্পষ্টভাবে স্বীকার করে। বুদ্ধদেব 'ধর্ম্মপথে' একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন,—"দেহরূপ গৃহ-নির্ম্মাতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে না পাইয়া কতবার জন্মগ্রহণ করিলাম, কত সংসারেই পরিভ্রমন করিলাম, পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ কি ক্লেশকর! হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিবে না, তোমার সকল ফাঁসি ফস্‌কে

গিয়াছে, গৃহকূট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণগত আমার চিত্তের সকল তৃষ্ণাই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।" (ধর্ম্মপথ—৮।৯) ঠিক এইরূপ কথাই যোগোপনিষদে ব্যাসদেবের নিকট শুকদেব বলিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-দর্শনে দেখিতে পাই মিলেটাসের থালেস প্রমুখ দার্শনিক-ত্রয়ের পর পিথাগোরাস্ ছিলেন প্রধান দার্শনিক। পিথাগোরাস্ আনুমানিক ৫৮২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সেম্‌স্‌দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি একটি কুকুরকে মার খাইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন— "থাম, ইহাকে মারিও না; ইহার স্বর শুনিয়া আমি ইহাকে চিনিতে পারিয়াছি, ইহার ভিতরে আমার একজন বন্ধুর আত্মা আছে। * পিথাগোরাসের পুত্র এম্পেদোক্লেস শুদ্ধি (Purifications) নামক দার্শনিক-কাব্যে জন্মান্তরবাদ বিবৃত করিয়াছেন। উক্ত কাব্যে তিনি লিখিয়াছেন,—"নিয়তির আদেশ আছে„ দেবতাগণের প্রাচীন বিধান আছে, যখনই কোন দেবাত্মা (Demons) রক্তপাত করিয়া হস্ত পঙ্কিল করে এবং পাপাচরণ করে, বিরোধ করে অথবা মিথ্যা শপথ করে, তখন তাহাকে স্বর্গলোক ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন প্রাণীরূপে পুনঃ-পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ৩০,০০০ বৎসর ভ্রমন করিতে হয়।...আমি এইরূপ একটি দেবলোকচ্যুত ভ্রমনশীল দেবাত্মা। ১১৫॥ আমি ইতিপূর্ব্বে (ক্রমান্বয়ে) বালক, বালিকা, ঝোপ, পাখী এবং সমুদ্রের বাক্‌শক্তিহীন মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ১১৭॥ আর যদি কোন দুষ্কর্ম্ম না করে, তবে আত্মা ঋষিরূপে, কবিরূপে, চিকিৎসকরূপে এবং নৃপতিরূপে জন্মগ্রহণ করে, এবং সেখান হইতে দেবতারূপে

*John Burnet : Early Greek Philosophy, London, 1930.

দেবলোকে আরোহন করে। দেবলোকে (এই সকল মুক্ত জীব) দেবতাদিগের সহিত আহার বিহার করে [কিন্তু] দুঃখভোগ করে না, নিয়তির দ্বারা শাসিত হয় না, এবং হিংসা করিতে পারে না। ১৪৬—১৪৭॥" *ভাগবতের ভিতরও আমরা এইরূপ উক্তিই দেখিতে পাই। ¶বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যশাস্ত্রের ৪০ কারিকায় "সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরবিধিবাসিতং লিঙ্গম্।" এই সূত্রের ভাষ্যে যেরূপ উক্ত আছে তাহার ভাবার্থ এই—"সূক্ষ্মদেহ পুনঃ পুনঃ স্থূলশরীর ধারণ করে এবং প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে জীর্ণ স্থূলদেহ ত্যাগ করে।" ইহারই নাম সংসরণ। উপনিষদে এই কথাটিরই প্রতিধ্বনি "নটবৎব্যবতিষ্ঠতিলিঙ্গম।" এইরূপ মৃদুভাষায় উক্ত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম অধ্যায়ের ২০।২১ শ্লোকে ইহার স্পস্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে; সুতরাং জীবের পূর্ণত্ব না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের গতাগতির বিরাম নাই। পরিবর্ত্তনশীল সংসার-চক্রের ইহাই আবর্ত্তন।

হিন্দুর সাংখ্য, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ন্যায় পাশ্চাত্য দর্শনেও যে কর্ম্মবিপাক, জীবন্মুক্তি বা চরম মুক্তির কথা উল্লেখ আছে, আমরা তাহারও প্রমাণ পাই। এম্পেদোক্লেস্ বলিয়াছেন,—"আমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছি; আমি তোমাদের (জন-সমাজের) মধ্যে অমর দেবতারূপে বিচরণ করিতেছি; সুতরাং পাশ্চাত্য দর্শনে জীবের পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর কথাও আছে। যদিও তাহাদের দর্শনের সহিত কতক অংশের প্রভেদ দেখিতে পাই,

*John Burnet : Early Greek Phisolophy, London, P. 224.

¶ভাগবত, ১১।১০।২৩—২৬ শ্লোক।

কিন্তু এম্পেদোক্লেসের বিবৃত গ্রীক্-জন্মান্তরবাদে এবং হিন্দু-জন্মান্তরবাদে সাদৃশ্যও অনেক। জন্মান্তর সম্বন্ধে মিষ্টার হেরোদোতস লিখিয়াছেন,—ঈজিপ্তীয়গণই প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, "মানুষের আত্মা অমর, মৃত্যুর পর আত্মা তিন হাজার বৎসরকাল জল, স্থল এবং বায়ু-মণ্ডলবাসী সকল প্রকার প্রাণীদেহেই বিচরণ করে···। ২।১২৩॥ *পিথাগোরাসের শিষ্যগণ এবং এম্পেদোক্লেস্ ছাড়া গ্রীক্‌দের মধ্যে দিউনিসসের (Dionysos) উপাসক ওর্ফিগণ জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিতেন। উল্লিখিত আছে,—পিথাগোরাস্ই প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, নিয়তির বিধানানুসারে আত্মা পুনঃপুনঃ বিভিন্ন প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ ঘুরিয়া বেড়ায়।" ** পারসীক্ অধিকারের যুগে আনুমানিক ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রচিত 'কোরিকোস্মোন (Korikosmn) নামক পুস্তকে জন্মান্তরবাদ স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে। তারপর 'হেরোদোতস', 'প্লাতো', 'থিওফ্রাষ্টস্', 'প্লুতার্ক' প্রভৃতি তৎকালীন দার্শনিকগণও যে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন, তাহাও অস্বাভাবিক নহে। †জন্মান্তর হিন্দু-বিশ্বাসের বিশেষত্ব। পিথাগোরাসের সম্প্রদায় এই মত বিশ্বাস

*হেরোদোতসের সকল বচন A. D. Godley কৃত ইংরাজী অনুবাদ (Loeb's Classical Library) হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ করা হইল।

**R. D. Hicks : Diogenes Laertins (Loeb's Classical Library).

†In the Greek testimoney : Eneyelopaedia of Religion and Ethics, Vol. 12, Edienburgh 1921 P. 431.

করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এম্পেদোক্লেস এবং প্লাতো এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন ওর্ফিক সম্প্রদায় হইতে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতেই নানাদেশ ঘুরিয়া এই মত [Indirectly] ওর্ফিকগণের নিকট পৌছিয়াছিল।‡‡

'থুরিও' এবং 'পেটেনিয়ায়' খোদিত ওর্ফিক-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কবিতাসহ যে সকল সোণার পাতলা পাত পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত জন্মান্তরবাদ-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সহিত ওর্ফিকগণের মতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ¶অধ্যাপক কীথ্ বলেন,—"গ্রীক্ জন্মান্তরবাদের মূল সম্ভবতঃ থ্রেস-দেশে অনুসন্ধান করিতে হইবে।...থ্রেস দেশীয় জালমোক্সিসের আখ্যায়িকায় থ্রেসদেশে জন্মান্তরবাদ প্রচলিত থাকার পরিষ্কার প্রমাণ।" *আধুনিক কালের আধ্যাত্মিকতত্ত্বের প্রধান গ্রন্থ 'সাইকি' (Psyche) প্রণেতা রোহ্ডে (Rohde) অনুমান করেন থ্রেসবাসী-দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত গেটাই বা জেটাই (Gatai) গণ জালমোক্সিস্ সম্বন্ধে এবং পরকাল সম্বন্ধে যে বিশ্বাস পোষণ করিতেন, তাহা জন্মান্তরবাদ সূচিত করে।

---

‡‡W. T. Stace : A Critical History of Greek Philosophy. London 1921, P. 17.

¶John Burnet : Early Greek Philosophy, 4th Edition, London P. 82.

†J. E. Harrison : Prolegomena to the study of Greek Religion, 3rd Edition, Cambridge 1922, P. 667.

জন্মান্তরবাদ যে ভারতবর্ষের বাহিরে নানাস্থানে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাবিত হইয়াছে, এই মতের অনুকূলে একরূপ প্রমাণ,—"জুলিয়স সীজার এবং দিওদোরাস্ লিখিয়া গিয়াছেন, কেল্টীও ড্রুইডেরা-জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন। জন্মান্তর সম্বন্ধে কেল্ট এবং টিউটনগণের মত হয়ত' গ্রীক্ হইতে লওয়া হইয়াছিল। স্বতন্ত্র-কেন্দ্রে জন্মান্তরবাদের স্বতন্ত্র উদ্ভাবনের অনুকূলে অন্যরূপ প্রমাণ,—আফ্রিকার এবং অষ্ট্রেলিয়ার কতকগুলি অসভ্য জাতির মধ্যে বর্ত্তমান-কালে জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস দেখা যায়; কিন্তু এই সকল জাতির বিশ্বাসে এবং গ্রীকের ও হিন্দুর জন্মান্তরবাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, মনুষ্যের আত্মা অন্য প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে; কিন্তু জন্মান্তর যে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার যে উপায় আছে, এ সকল তত্ত্ব ভারতবর্ষ এবং গ্রীক্ ভিন্ন অন্য আর কোথায়ও জন্মান্তরের সহিত যুক্ত দেখা যায় না। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি গ্রীক্-দার্শনিক হেরোদোতসের লিখিত মত। কিন্তু প্রাচীন পালি বৌদ্ধগ্রন্থে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আর্য্যাবর্ত্তের যে প্রমাণ পাই, তাহাতে দেখা যায় আর্য্যা-বর্ত্ত তখন জন্মান্তরবাদ-বিশ্বাসে প্লাবিত ছিল; সুতরাং পূর্ণাঙ্গ জন্মান্তরবাদের উদ্ভাবন একমাত্র হিন্দুর কীর্ত্তি বলিয়াই স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

বৌদ্ধদিগের জাতকগ্রন্থে ভগবান বুদ্ধদেবের অনুভূত পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতির বিষয় অনেক স্থানে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। উপদেশ প্রসঙ্গে প্রায়ই তিনি শিষ্য-মণ্ডলীকে বলিতেন,—পূর্ব্বে বারানসী নগরে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে যখন আমি অমুক ছিলাম, তখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বে তক্ষশীলায় যখন অমুক ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তখন আমি তাঁহার সহকারী হইয়া *** এইরূপ করিয়াছিলাম। এই সারীপুত্র আমার সহচর ছিল। ইত্যাদি—

গীতাতে আমরা দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "হে অর্জ্জুন! তোমার এবং আমার কতবার জন্ম হইয়াছে, আমি সে বিষয় অবগত আছি কিন্তু তোমার তাহা স্মরণ নাই।* ভাগবতে দেখিতে পাই বসুদেব নারদকে বলিয়াছেন,—"আমি পূর্ব্বজন্মে মায়ায় মোহিত হইয়া পুত্রার্থে উপাসনা করিয়াছি, মুক্তি-লাভের জন্য উপাসনা করি নাই।"** ভাগবত পুরাণাদির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে তাহার অন্ত থাকিবে না।

এইক্ষণ সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে জন্মান্তর সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতে কতিপয় প্রমাণের উল্লেখ করিব। পাতঞ্জল যোগ-সূত্রে উক্ত আছে,—"সংস্কার-সাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্" পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মৃতিজনক শক্তিকেই সংস্কার বলে। এই সংস্কারের প্রতি প্রনিধান করিয়া চিন্তা করিলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। দেখা যায় ইতরপ্রাণীদের মধ্যে সদ্যোজাত শাবকে

*গীতা, ৪।৫ শ্লোক।

**ভাগবত, ১১।২।৮

পূর্ব্ব সংস্কার পরিস্কাররূপে প্রস্ফুটিত হয়। বানর শিশু মাতৃগর্ভ হইতে মস্তক ও হস্ত বাহির করিয়াই বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করে, গো, মহিষাদি পশুগণের বৎস্যগণও প্রসবান্তে মাতৃস্তন্যের আস্বাদ লইতে যায়। হংস শাবক সন্তরণ করে। মানবের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই একই মাতৃগর্ভেজাত সন্তানের মধ্যে পরস্পর ভাবের ও সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য অনেক। কেহবা চিত্র বিদ্যায় কেহবা সঙ্গীতে এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের পূর্ব্ব সংস্কার লইয়া এক একজন এক এক বিষয়ের প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, সহজাত সংস্কার জনিত ব্যাপার শুধু শিক্ষা ও সাধন সাপেক্ষ নহে, উহা সাংসিদ্ধিক বা স্বয়ং সিদ্ধ। অনুশীলনে উহা পরিমার্জ্জিত হয় মাত্র। †

অপর জীবের জন্মগত রাগদ্বেষ ইত্যাদি সহজাত ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ন্যায় দর্শনের তৃতীয় আহ্নিকের প্রথম অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে উক্ত আছে, "বীত রাগ জন্ম দর্শনাৎ।" ইহার বাৎসায়ণ ভাষ্যে, যাহা উক্ত আছে তাহার ভাবার্থ এই "জীব বিবিধ বিষয়ে রাগযুক্ত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে, নতুবা জাতমাত্র জীবে রাগানুবন্ধ-দৃষ্ট হয় কেন? সুতরাং রাগ, দ্বেষ, হিংসা, সরলতা প্রভৃতি ভাবগুলি জাতকের পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুচিন্তন বশতঃই হইয়া থাকে। জন্মান্তর না থাকিলে পরস্পরের ভিতর এত ভাবের বৈষম্য সম্ভবপর হইত না।" পূর্ব্ব আস্বাদিত বস্তুর পূর্ব্বানুভব জন্মান্তরে গৃহিত নবশরীরে উৎপন্ন হয়। জন্মান্তর আছে বলিয়াই পূর্ব্বাভ্যাস অনু-

---

†"প্রেত্যাভ্যাস কৃত্যাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ" ন্যায়সূত্র ৩.১.২১ বাৎসায়ণভাষ্য

করণ সম্ভবপর, অন্যথা উহা অসম্ভব হইত। জীবের জীবন কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি (Bundle of habits) মাত্র। এই স্বভাব অনুকরণ করিয়াই জীবের আধ্যাত্মিক পরমাণু সমষ্টি মাতৃগর্ভে জরায়ুর মধ্যে এমন একটি ইথিরীয় ছাঁচে পরিপূর্ণ হয়, যাহা সর্ব্বতোভাবে জাতকের স্বভাবের অনুরূপ। জাতি, আয়ু, ভোগ, এবং জন্ম জীবের কর্ম্ম বিপাকেই হইয়া থাকে। *কামনা বাসনাই জন্মান্তরের মূল কারণ। প্রশ্ন হইতে পারে জন্মের আদিতে বৈষম্যের সৃষ্টি কেন হইল? ইহার উত্তর বাদনারায়ণ সূত্রে ‡ এবং শঙ্কর-ভাষ্যে উক্ত আছে, "সৃষ্টি যখন অনাদি তখন উক্ত আপত্তি অমূলক" মৃত্যুভয় ও জীবের সহজাত সংস্কার, তাই পাতঞ্জলী যোগসূত্রেও জন্মান্তর সম্বন্ধে বলিয়াছেন "তাসাম অনাদিত্বম, আশীষো নিত্যত্বাৎ।" সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক সকল ধর্ম্মমতেই যে জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন আমরা তাহার প্রমাণ পাই। এই জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই তাহার সবিস্তার আলোচনা জন্মান্তর রহস্য মূলক "অভিশপ্ত"§ নামক পুস্তকে প্রকাশ করিতে বাসনা রহিল।

---

*যোগসূত্র, ৩।১৩। মুণ্ডক উপনিষদ্ ৩।২।২।

‡অবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ। ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৫।

§মদ্রচিত জন্মান্তর রহস্যমূলক পুস্তক। (যন্ত্রস্থ)

জন্মরোধ।

এই জন্মরোধ বলিয়া বর্ত্তমানে দেশে বিদেশে যে একটা সোর-গোল উঠিয়াছে আমরা তাহার মীমাংসা মনুতে পাই। বেদ-পন্থীর মনে এই একটা চিরজাগ্রত ভয় ছিল যে বেদ দ্বারা সে জন্ম, আয়ু, ভোগ সমস্তই শাসন করিতে পারে। সংহিতায়, আরণ্যকে, উপনিষদে জন্মশাসনের বহু প্রচেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায়। গর্ভাধানকে বৈদিক যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা শাসিত করিবার চেষ্টায় যে অকুণ্ঠ সাহস প্রকটিত রহিয়াছে তাহা এই অত্যাধুনিক "অলজ্জ বৈজ্ঞানিকের" যুগেও বুঝিবা দুর্ল্লভ। এই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিতে গিয়া মনু বলিতেছেন—ইহাদের দ্বারা "ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ"—এই দেহকেই ব্রহ্মধারণার উপযোগী করা হয়। আমার সবখানিকে ব্রহ্মময় করিয়া তুলিব, ব্রহ্মবিদের আত্মাহুতিতে ব্রহ্মবিদের আবির্ভাব ঘটিবে—ইহা কম স্পর্দ্ধার কথা নয়। দেহকে ব্রহ্মময় করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় আইডিয়ালিজম্ ও মেটেরিয়ালিজমের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় করা হইয়াছে, জীবনের যে অখণ্ড আস্বাদনের সূচনা করা হইয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের ভাবুকদিগেরও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী দার্শনিক পল্ রিশার বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে মানুষের ভাব যে পরিমানে বিকশিত হইতে চাহে, দেহ যেন সে পরিমানে ফুটিতে চাহে না। এই দ্বন্দ্বে প্রকৃতিতে একটা পীড়া সঞ্চিত হইতেছে। সুতরাং বিকৃত উপায়ে প্রকৃত পথ ত্যাগ করিয়া

চলিবার দরুণ ক্রমশঃ যে আমরা অতিমানবেরযুগ হইতে পঙ্গু-মানব জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছি (!) এ সমস্যার সমাধান করিবে কে? বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী মহাত্মা গান্ধী বৈদিক যুগের আদর্শে এই সমস্যার সমাধান কল্পে প্রতিবাদ করিয়া তরুণ তরুণীগণের কুটিল কটাক্ষ হইতে বঞ্চিত হন নাই, আর অন্যের কা কথা! সেই অভিনবের আবির্ভাবকালে প্রকৃতির গর্ভবেদনা রিশারের উক্ত কল্পনার সহিত মনুর উক্তি মিলাইয়া দেখিলে সম্ভবতঃ ইভলিউশনবাদী বৈজ্ঞানিক বৈদিক-যুগ-সম্বন্ধে একটা নূতন চিন্তার ইঙ্গিত পাইবেন। আমরাও বলিতে চাই, বেদে দেহে এবং দেহাতীতে ব্রহ্মেরই সহজ স্ফুরণের ইঙ্গিত স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে, উহাই যথার্থ পথ। নান্য পন্থাবিদ্যতেঽয়নায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভুবন তত্ত্ব।

এই পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের মধ্যে এক নয়, দুই নয় সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড যথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণপ্রধান নারায়ণাংশ চতুর্ম্মুখ হইতে সহস্রমুখ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অধিষ্ঠিত থাকিয়া

সমুদ্রে মৎস্য ও বুদ্বুদাদির ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। বরং ধূলি-কণার সংখ্যা গণনা করা যাইতে পারে তথাপি বিশ্বের ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা কদাপি নির্ণয় করা যায় না। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রকাণ্ড উদরে অর্থাৎ মহাচিদ্গগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। কিন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর দৃষ্ট হয় না। এই পরিদৃশ্যমান জগতই ব্রহ্মের অখণ্ডিত রূপ। এই সমুদয় বিশ্ব সেই বিরাট পুরুষের অবয়ব মাত্র। এই বিরাট পুরুষকেই পুরাণাদিতে ব্যাস, পরিধি, উচ্চ ও নিম্নভেদে চতুর্দ্দশ ভুবন রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পরব্রহ্ম অনাদি এবং অনন্ত, অজ্ঞানশক্তি তাঁহার সর্ব্বাংশব্যাপিয়া আবির্ভূত হয় না। শ্রুতিতে উক্ত আছে,—"পাদোহস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অর্থাৎ ব্রহ্মের এক অংশে সৃষ্টিক্রিয়া আর তিন অংশ নিত্যমুক্ত আনন্দ স্বরূপে অবস্থিত। কেবল যে অংশে সৃষ্টি ক্রিয়া হইতেছে সেই সগুণভাবপ্রাপ্ত অংশই উর্দ্ধদিকে সপ্তস্বর্গ এবং নিম্ন দিকে সপ্ত পাতাল বলিয়া কীর্ত্তিত। স্বর্লোকে সাত্ত্বিকাংশে দেবতাবৃন্দ এবং পাতালাদিতে রাজসিক এবং তামসিকবৃত্তিসম্পন্ন গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষসাদি প্রেত পিশাচ এবং অপস্মারক, অপ্সরা, ব্রহ্মরাক্ষস, কুষ্মাণ্ড, বিনায়ক প্রভৃতি দেবযোনি সমূহ বাস করেন।

বেদে আছে তিনটী ভুবনের কথা, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আর দৌঃ। এই তিনটী লোকই ত্রিগুণিত হইয়া পুরাণের সপ্তলোক হইয়াছে। বেদে যাহা সূক্ষ্ম আভাসিত পুরাণে তাহাই বিস্তৃত

ভাবে চিত্রিত। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যৌঃ পুরাণের ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ অথবা মনুষ্যলোক, প্রেতলোক ও পিতৃলোক। কিন্তু সমষ্টি হিসাবে এই তিনটী লইয়াই আবার বৈদিক পৃথিবীলোক। যাহারা এই পৃথিবীর মানুষ অর্থাৎ এখানকার কামনা বাসনা যাহাদের মিটে নাই, তাহারাই এই তিনলোকের মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে। তাই বেদে ইহাকে বলা হইয়া থাকে **মর্ত্ত্যলোক**। মর্ত্ত্য শব্দটী পারিভাষিক। মাধ্যাকর্ষণের টান যেমন একটা জগতের কিছুদূর পর্য্যন্ত ক্রিয়াশীল, তেমন এই মাটীর টানও ঐ তিনটীলোক পর্য্যন্ত ক্রিয়াশীল। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে এইরূপই বুঝাইয়াছেন সাতটী লোক ভুবনের স্তর বা থাক। অবীচি হইতে মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভূলোক। মেরুপৃষ্ঠ হইতে ধ্রুব পর্য্যন্ত তারা নক্ষত্র বিভূষিত অন্তরীক্ষলোক এবং অপর পাঁচটী স্বর্লোক। তন্মধ্যে প্রথমতঃ মহেন্দ্রলোক (স্বর্গলোক) তৎপর প্রাজাপত্য মর্হলোক এবং পরিশেষে তিনটী ব্রহ্মলোক। তাহাদের নাম যথাক্রমে জনঃ তপঃ এবং সত্যলোক।

যাঁহারা মর্হলোকে আছেন তাঁহারা ভূলোককে তাঁহাদের মধ্যে অনুভব করেন। তাঁহারা ভূলোকের শাস্তা ও নিয়ন্তা। যাঁহারা জনলোকে আছেন তাঁহারা ভূঃ এবং ভুবঃ এই দুইটী লোককে তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পান। তাঁহারা ঐ দুইলোকের প্রভু। আর যাঁহারা তপলোকে আছেন তাঁহারা ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ এই তিন লোককেই তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাইয়া থাকেন। তাঁহারাই ঐ তিনলোকের ইন্দ্র। মহঃ, জনঃ ও তপঃ এই তিনটী লোককে

বৈদিক ভাষায় বলা হইয়াছে :—অন্তরীক্ষলোক। অন্তর অর্থ মধ্য, ঈক্ষ অর্থ দেখা, যে লোকের মাঝে অপর লোক সমূহকে দেখা যায় তাহার নামই অন্তরীক্ষলোক। গায়ত্রীর ব্যাহৃতিভাগে ভুবঃ বলিতে এই বৈদিক ভূবলোক বা ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মাবস্থারূপী অন্তরীক্ষলোকেই বুঝিতে হইবে।

ঐ উল্লিখিত ছয়টীলোকের পর সত্যলোক বা ব্রহ্মাণ্ডা-ধিপতির আসন। সত্যলোক অপর ছয়টীলোককেই গ্রাস করিয়া অবস্থান করিতেছে। অর্থাৎ যাঁহারা সত্যলোকে অবস্থান করিতেছেন তাঁহারা ছয়টীলোককেই তাঁহাদের মধ্যে অনুভব করিয়া থাকেন। এই সত্যলোকই বেদের দ্যুলোক। পৃথিবীকে (পুরাণের ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃকে) আবেষ্টন করিয়া অন্তরীক্ষলোক। আবার পুরাণের মহঃ, জনঃ, তপঃ এই তিনলোক, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষলোককে আবেষ্টন করিয়া দ্যুলোক (পুরাণের সত্যলোক) এ যেন ঠিক Chinise box একটা আর একটার মধ্যে ঢাকা। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই একই নিয়ম। আমাদের এই ক্ষুদ্রদেহ-ভাণ্ডারের ভিতর পরস্পর একে অন্যকে জড়াজড়ি করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সূক্ষ্মসত্ত্বাসকল রহিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্রই এই একই-লীলার ক্রিয়া দেখিয়া আধুনিক জড়বৈজ্ঞানিকগণ স্তম্ভিত হইয়া যান। একটি ক্ষুদ্র পরমাণুর ভিতরও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আভাস রহিয়াছে। জগতটা যে একটা জাল দিয়া বোনা তাহা দার্শনিকগণ স্পষ্টই বুঝিয়াছেন। সাংখ্য ত্রিগুণবাদদিয়া এবং বৈদিকগণ পৌরাণিক লোকসংস্থানে ত্রিগুণেরই আভাস দিয়াছেন। পৃথিবী

স্থূল, অন্তরীক্ষ সূক্ষ্ম এবং দ্যুলোক কারণ। ইহাই পরলোক সম্বন্ধে সাংখ্য সম্মত ব্যাখ্যা।

স্বর্লোকের ভৌমিকত্ব সম্বন্ধে স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী এবং কতিপয় পণ্ডিতের যে সকল পৌরাণিক ব্যাখ্যা (!) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহারা যদি এই পৃথিবীতেই সপ্তস্বর্গ, নরক ও পাতালের কল্পনা করিয়া থাকেন, তবে যাবতীয় পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মের মূল ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে যাহা সূক্ষ্মে আছে স্থূলে তাহার কল্পনা করিয়া যেমন স্থূল দেব দেবীর কল্পনা পুরাণ ও তন্ত্রে উক্ত আছে, সূক্ষ্মের তৈজসলোক সমূহও পুরাণে তেমনি ভাবে কল্পিত। সূক্ষ্মদেহ (Astral double Ethereal Counter part of the Physical body) যেমন স্থূলে নানরূপ লইয়া অবস্থিত সূক্ষ্মেও তেমনি তেজোময় হইয়া তৈজস ভূমিতে অবস্থিত আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সমূহকে পুরাণের স্বর্লোকাদি বলিয়া স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। স্বর্গ, ভূ-স্বর্গ, কৈলাস, ভূ-কৈলাস ইহার তাৎপর্য্য কি? নিম্নোক্ত পৌরাণিক লোকতত্ত্বের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে ঐ লোক সমূহ ভূ-স্বর্গ না হইয়া আদৌ উক্ত লোকসমূহ এবং উক্ত লোকের দেবযোনিসমূহ তেজোময় দেহধারী হইয়া তেজোময়লোকে অবস্থিত। শাস্ত্রে আছে মাহেন্দ্রলোকে (স্বর্লোকে) ছয়প্রকার দেবযোনি আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত্ত, যাম্য তুষিত, অপরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী ও পরিনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী। তাঁহারা সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ ও অনিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন,

পূজ্য ও কামভোগী। ধর্ম্মবিশেষদ্বারা অতিসংস্কৃত, অণু হইতে মাতৃ-পিতৃ সংযোগ ব্যতীরেকে অকস্মাৎ ইঁহাদিগের দিব্যশরীর আবির্ভূত হইয়া থাকে।

মহঃলোকে পাঁচ প্রকার দেবযোনি :—কুমুদ, ঋভু, প্রতর্দ্দন, অঞ্জনাভ ও প্রতিচাভ। মহাভূত সমূহ ইঁহাদের বশে এবং ইঁহারা ধ্যান মাত্র সুখে তৃপ্ত থাকেন। ইহার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক। প্রথমতঃ **জনলোক**। এখানে চারি প্রকার দেবযোনি অবস্থান করেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে ব্রহ্মপুরহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্ম-মহাকায়িক ও অমর। ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বশে। তৎ-পরলোক **তপোলোক**। তপোলোকে তিন প্রকার দেবযোনি :—আভাস্বর, মহাভাস্বর ও সত্যমহাভাস্বর। ভূত, ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র এই দেবতাবৃন্দের অধীনে। সকলেই ধ্যানমাত্রসুখেতৃপ্ত, ঊর্দ্ধরেতা, ঊর্দ্ধসত্যলোকের অপ্রতিহতজ্ঞানবিশিষ্ট এবং অবীচি হইতে তপোলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েরই অনাবৃতজ্ঞানযুক্ত। এর পরেই **সত্যলোক**। এখানে অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞা-সংজ্ঞী। এই চারিপ্রকার দেবযোনি। ইঁহাদের বাসভবনের প্রয়োজন করে না, আধার অভাবে সকলেই স্বপ্রতিষ্ঠ। উপর্য্যু-পরি ইহাঁদের অবস্থান। প্রকৃতি ইঁহাদের বশে এবং সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয় ইঁহাদের ইচ্ছায় প্রবর্ত্তিত হয়। অচ্যুতেরা সবি-কল্পধ্যানে তৃপ্ত, শুদ্ধনিবাসেরা সবিচার এবং সত্যাভেরা আনন্দমাত্র ধ্যানে তৃপ্ত। আর সংজ্ঞা-সংজ্ঞীরা অস্মিতা মাত্র ধ্যানে তৃপ্ত। এই সত্যলোক পর্য্যন্তই ভুবন মধ্যে গণ্য হয়। বিদেহলয় বা

নির্ব্বিকল্প সমাধিলয়েরা মোক্ষপদে অবস্থান করেন। অতএব লোক-মধ্যে তাঁহাদিগকে বিনস্ত করা হইল না। উর্দ্ধে উপরোক্ত সপ্তলোক এবং নিম্নে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই চতুর্দ্দশলোক লইয়াই ভুবন। সূর্য্যদ্বারে অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ীতে সংযম করিলে যোগীগণ ঐ সমস্ত লোকের তত্ত্ব জানিতে পারেন।

পঞ্চকোষের ক্রম বিকাশ।

এই জাগতিক প্রপঞ্চ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, আমরা দেখিতে পাইব যে, এই জড়জগৎ হইতে ক্রমশঃ চেতন-জগৎ বা উন্নত রাজ্যের স্তরে স্তরে প্রকৃতিমাতার আনন্দের স্নিগ্ধ-জোতিঃমণ্ডিত সুধাময় হাসি যেন গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। প্রকৃতিমাতা তদীয়া জীর্ণতম বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রজঃ-সত্ত্বের উজ্জ্বল আবরণে যতই আপন অঙ্গ আবরণ করিতেছেন, শনৈঃ শনৈঃ তমোময় আবরণ ও অপসারিত হইয়া ততই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। কেননা, আলোকের প্রভায় অন্ধকার স্বভাবতঃই সুদূরে পলায়ন করিয়া থাকে। মধুমাসে মধু ও মাধবীর প্রকৃতির সহ বিলাস, প্রফুল্লিত-কাননে ফুল্লকুসুমরাশির সৌরভময়হাসি, প্রকৃতিমাতার অনুপম বসন পরিধান মৃদু মন্দ মলয়ার হিল্লোল আর তাহারই হাওয়ায় আকুলিত প্রাণা কোকিলার কাকুলি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা কি

মনে হয় না যে, উদ্ভিদ্ জগতের ও ব্যষ্টি-সমষ্টি প্রকৃতির আনন্দের ক্রমোবিকাশ হইয়া থাকে! দার্শনিকনেত্রে জগতের এই বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যলাভের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্য দর্শক-মাত্রেরই হৃদয়ে আনন্দের সিন্ধু উদ্বেলিত হইবে, সন্দেহ নাই।

আবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃতির আরও একটু উচ্চস্তরে আরোহন করিয়া দেখিলে আমরা দেখিব যে, ভূচর ও খেচরগণের পারস্পারিক সৌহার্দ্দ, একে অন্যের সহিত প্রেমভাব, অপূর্ব্ব অপত্যস্নেহ, স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও শাবকের জীবন রক্ষণ, নির্ব্বাক প্রেমবিলাস, পশুসুলভ প্রেমের পরিচয় প্রদান ইত্যাদি বিষয় কি উক্ত আনন্দেরই সত্বা বলিয়া বিবেচিত হইবে না? এইরূপে প্রকৃতির ক্রম অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ সত্বার ও ক্রমোবিকাশ হইয়া থাকে। প্রকৃতির যতই তমো আবরণ উন্মোচন হইতে থাকে, ততই রজঃ ও সত্বের শুভ্র আলোকে আনন্দের বিমল প্রতিভা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তদন্তর মনুষ্যযোনিতে জন্মলাভ করিয়া আনন্দসত্বার দিব্যালোকে প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকটিত হয়। বেদান্তদর্শনমতে সৃষ্টিতত্ত্বে যে পঞ্চকোষের ক্রমোবিকাশ, অর্থাৎ উদ্ভিজে (অন্নময়কোষে) স্বেদজে (অন্নময় ও প্রাণময়কোষ) এবং জরায়ুজে (মনুষ্যেতর জীবে) উক্ত দুইটী কোষের সঙ্গে মন ও বিজ্ঞানময়-কোষের বিকাশ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কেবল মনুষ্যের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত অন্নময়াদি চারিটী কোষের সঙ্গে আনন্দময়কোষের বিকাশ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত মানুষ্যের মুখেই আনন্দের সুস্পষ্ট হাসির রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতর প্রাণী হাসির দ্বারা

হৃদয়ের আনন্দসত্ত্বার বিকাশ করিতে পারে না। মানবের এই স্পষ্ট হাসিই তাহার আনন্দময়কোষের পরিচয় দেয়। এইরূপে মানুষ যতই উন্নত হয়, ধর্ম্মধ্বজা অবলম্বনপূর্ব্বক ততই প্রকৃতির উচ্চ হইতে উচ্চতর রাজ্যে আরোহন করে এবং ততই তাহার আনন্দসত্ত্বার বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপে জীব ক্রমে ক্রমে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। জড়ত্ব হইতে চেতনত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি পরিহারে জীব মানবত্ব লাভ করে, আবার মানবত্ব পরিহারে ক্রমে দেবত্ব, দেবত্ব হইতে ক্রমে ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া পূর্ণতার অন্তিম সীমায় পৌছিয়া পূর্ণরূপেই অবস্থিত থাকেন। তাই ঋষি গাহিয়াছেন :—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

সাধক যখন প্রকৃতিরাজ্যের অতীত জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীর অপগমে নির্ব্বিকল্প সমাধিপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার তমোময় আবরণের সম্যক অভাবহেতু আনন্দসত্ত্বার বিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে এমন ভাষা নাই, ইহা মৌন বাগ্যাদ্বারাই প্রকাশিত হইবার যোগ্য। যে স্থান, চন্দ্র, সূর্য্য আলোকিত করিতে পারে না, অগ্নির আর কি কথা! সেই নিত্য জ্যোতির্ম্ময় আনন্দধামই ভগবানের পরমপদ নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থিত রাজযোগীর আবাসস্থল। এই দ্বন্দ্বরহিত প্রকৃতি-পারাবার পরস্থিত অখণ্ড সচ্চিদানন্দপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই জীব জনন-মরণ-চক্রের নিষ্পেষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে —

মরণ-রহস্য

দ্বিতীয় অংশ।

আত্মিক সংবাদ।

মানবাত্মা স্থূলদেহ ত্যাগের পর যে অদৃশ্য সূক্ষ্মদেহ (যাহা অনেক পাশ্চাত্য গ্রন্থে (Astral double Etheral Counterpart of the physical body) নামে অভিহিত হইয়াছে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ববৎ জীবিতের ন্যায় ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার সুখ-দুঃখের অবস্থায় অবস্থান করে। এই সকল আত্মা প্রয়োজন বোধ করিলে কখন কখনও অবিকল তাহাদের পূর্ব্বদেহের অনুরূপ ছায়া মূর্ত্তিধারণ করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। অথবা কোনও স্থূলদেহ আশ্রয় করিয়া নানাবিধ ভোগ উপভোগ আদি করিতে পারে। স্থূলজগতে যেমন অসংখ্য স্থূলদেহধারী সূক্ষ্মজগতেও তেমনি অসংখ্য সূক্ষ্মদেহধারী আত্মা প্রতিনিয়ত আমাদের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। আমাদের স্থূলইন্দ্রিয় তাহাদিগকে অনুভব করিতে পারে না, সূক্ষ্মবিষয় সূক্ষ্মইন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব্য। তবে

যে, কোন কোন সময় আমরা তাহাদিগকে অবিকল স্থূলদেহের ন্যায় নয়ন গোচর করিয়া থাকি, তাহা কিরূপে সম্ভব পর হয়, একটি উদাহরণ দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতে পারে। হাইড্রোজেন্ (Hydrogen) ও অক্সিজেন্ (Oxygen) স্বয়ং অদৃশ্য পদার্থ, কিন্তু উহাদের মিশ্রণে সমুৎপন্নজল দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তরল-পদার্থ। আবার সেই জল নৈসর্গিক কারণ বশতঃ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া পুনঃ অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থিত হইতে পারে। আবার উহাই ঘনীভূত হইয়া বা জমাট বাঁধিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন অবস্থা ধারণ করিতে পারে। এবং ইহাও অতি বিস্ময়জনক ব্যাপার যে জল জমিয়া, প্রস্তরবৎ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহার আয়তন সঙ্কুচিত না হইয়া বরং প্রসারিতই হয়। সুতরাং উহার আপেক্ষিক গুরুত্বের হ্রাসই হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বরফ জলে ভাসিয়া থাকে। যদি ইহাই সম্ভবপর হইতে পারে, তবে সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত সূক্ষ্মদেহাশ্রিত আত্মা সচরাচর অদৃশ্য হইলেও কখনও কখন তাহারা যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে, ইহা আর অসম্ভব বা বিচিত্র কি? ইহজীবনে কোন না, কোনও অবস্থায় প্রায় সর্ব্বসাধারণেই উহাদের সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিম্নে কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

এই অভিশপ্ত জীবনের দুর্ব্বিসহ ভার নামাইতে মোহবশতঃ কতবারই না মরণের মুখে মাথা পাতিয়া দিয়াছি, জলে, আগুনে, বিষে, বৈধ, অবৈধ উপায়ে মরিতে চেষ্টা করিয়াছি জানিনা কোন অজানা শক্তির প্রভাবে মরিতে পারি নাই, কিন্তু মরণের দুয়ার

হইতে ফিরিয়া অনেক অজ্ঞেয় তত্ত্বই জ্ঞাত হইয়াছি। একবার জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। তখন অনুভব হইয়াছিল :--আত্মরক্ষা করিবার যখন সমস্ত চেষ্টাই ছাড়িয়া দিলাম, তখন আর আমার কোন কষ্টই রহিল না। মৃত্যু যে এত আনন্দের হইবে, ইহা ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমার শরীর হিম হইয়া গেল, কি শ্বাস বন্ধ হইয়া গেল—ইহার আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মনে হইতেছিল যেন খুব কোমল শয্যায় কে আমাকে শোয়াইয়া দিয়াছে। চতুর্দ্দিকে, স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এমন মধুর সঙ্গীত আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। সহসা শুভ্রজ্যোতিঃতে চরাচর পূর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা কিছুই নাই অথচ অলৌকিক শুভ্র দীপ্তিতে যেন সব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এমন আশ্চর্য্য আলোক আমি কখনও আর দেখি নাই। সঙ্গীতের ধ্বনি ক্রমে মৃদু হইয়া গেল, কিন্তু একেবারে থামিয়া গেল না এই সময় আমার গতজীবনের সমস্ত ঘটনাবলী বায়োস্কোপের দৃশ্যের ন্যায় অবিকল জ্ঞান চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম।** এইরূপ আনন্দে বিভোর হইয়া কতক্ষণ ছিলাম জানি না, হঠাৎ আমি যেন অচেতন হইয়া পড়িলাম। এই অচেতন অবস্থা হইতে ক্রমে সচেতন হইয়া বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম এবং আমি দেখিলাম, আমি একটি পাথরের উপর পড়িয়া রহিয়াছি।*****

আনলড্ সিগ্রিড্ নামে এক ব্যক্তি আল্পস্ পাহাড়ের কাপ-পোটাক চূড়ায় উঠিবার সময় বরফ ধ্বসিয়া কয়েক হাজার ফিট নিচে পড়িয়া যান। অচেতন ও সাংঘাতিক জখম অবস্থায় তাহাকে

হাঁসপাতালে লইয়া আসা হয়। চেতন হইলে সিগ্রিড্ বলিয়াছিলেন— "বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমি মরিয়া গিয়াছি। কিন্তু তাহার জন্য আমার কোন ভয় বা দুঃখ হইল না। যদি আত্ম রক্ষা করিবার কোন সুযোগ থাকিত তবে হয়ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতাম, কিন্তু যখন বুঝিলাম নিজকে বাঁচাইবার কোনও উপায় নাই, তখন একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া গেলাম। আমারমস্তিষ্ক তখন খুব দ্রুত চলিয়াছে, সময়ের জ্ঞান কিছুই ছিল না।*** একবার স্ত্রী পুত্রের কথা মনে পড়িয়া বড় কষ্ট হইল; আবার জীবন-বীমার কথা মনে হইতেই সে কষ্ট দূর হইল। তারপরই মনে হইতে লাগিল আমি যেন রক্ত-মাংসের দেহটা ছাড়িয়া পরমানন্দময় অমরজীবন লাভ করিতে যাইতেছি। সমস্তটা জগৎ যেন চোখের সামনে দেখিতে পাইলাম মানবের বাদ-বিসম্বাদ' দুঃখ-দারিদ্র সমস্তই আমার জ্ঞান গোচর হইল। সুখের রহস্য যেন আমি বুঝিতে পারিলাম। মনে হইল যদি ফিরিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারিতাম। আমার কর্ণে শান্তি ও আনন্দময় সুর-লহরী, গুঞ্জরিত হইতে লাগিল,—মনে হইল—বিশ্বসংসার যেন সঙ্গীতের স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে।***

সঙ্গীরা আমাকে যখন বিছানায় আনিয়া শয়ান করাইল তখন আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অচল। ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করিয়া জীবনের কোনই চিহ্ন অনুভব করিলেন না। কিন্তু আমি তখনও সচেতন থাকিয়া মহা আনন্দ উপভোগ করিতেছি। ***

মেয়েরা আমাকে ঘিরিয়া কাঁদিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল যে, একবার তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেই —মরণ কত সুখের,কিন্তু তাহা পারিলাম না। পাহাড় হইতে পড়িবার সময় মস্তিষ্কের ক্রিয়া যেমন দ্রুত ছিল, তেমন না হইলেও স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বেশী দ্রুত ছিল। জীবন সম্বন্ধে দীর্ঘ বিচারে তন্ময় হইয়া যাইতাম।*** হঠাৎ একদিন আমার মনে হইল,আমার বড়কষ্ট, আর আমি অচেতন হইয়া পড়িয়াছি। যখন পুনর্জ্জীবিত হইলাম তখন আমার ভয়ানক কষ্ট অনুভব হইল। মৃত্যুকালীন সুখের কথা মনে পড়িলে এখনও আমার খেদ হয়।"

পরিব্রাজক অবস্থায় একবার জনৈক বন্ধুর আশ্রয়ে অবস্থান কালীন আমি কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হই । দৈবদুর্ব্বিপাক! — অপ্রত্যাশিত মর্ম্মাঘাতে জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধিই হইতে থাকে। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের তাপ,গাত্রদাহ ও পিপাসা এত মাত্রায় বর্দ্ধিত হইল যে,আমার মনে হইতে লাগিল আমি যেন তপ্ত লৌহ কটাহে রমধ্যে, পিপাসায় আমার বুকের ছাতি ফাটিয়া যায়, মনে পড়ে একবার বুঝি "একটু জ—ল, বা—তা—স—"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম।অজ্ঞান হইবার প্রাক্কালে আমার সমস্ত শরীরের নিম্ন দিকটা যেন অবশ হইয়া গেল এরূপ অনুভব করিয়াছিলাম। পরিশেষে রাত্রে দীপালোক প্রকাশিত গৃহ হঠাৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হইলে যেমন তদভ্যন্তরস্থ কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না, ঠিক সেইরূপই আমার জ্ঞানালোক নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আমি অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া গেলাম, বাহ্যজগতের বিষয় সমূহ আমার অনুভূতির সম্পূর্ণ বাহিরে লুপ্ত হইল। কিয়ৎকালের জন্য আমার বা আমার আত্ম-

চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্ব যেন হারাইয়া ফেলিলাম। এই সময়ের কোন কথাই আমি বলিতে পারি না। তাহার কিয়ৎকাল পরে (পরে বুঝিতে পারিয়াছি,কয়েক ঘণ্টা পরে) আমার চৈতন্যসঞ্চার হইল। তখন আমি দেখিলাম বা অনুভব করিলাম, আমার ঐ দেহটির ন্যায় যেন আরোও একটি দেহ আমার শয্যাশায়ী দেহের উপরিভাগে ঠিক একই রূপ আকারে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে শূন্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি গৃহের মধ্যে শায়িত থাকিলেও আমি যে স্থানে শূন্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তাহার উপরে যেন আমার কোনও গতি রোধক বা প্রতিবন্ধক কিছুই নাই। এইরূপে আমার চৈতন্যসঞ্চার হইলে আমার মনে কোনও রূপ কষ্টের উদ্রেগ না হইয়া যেন স্ফূর্ত্তিই বোধ হইতে লাগিল। চারিদিকে অতি সুন্দর নানা প্রকার রং দেখিতে লাগিলাম। আমার মন বড়ই প্রফুল্ল হইল,রোগ যাতনা কিছুই আর রহিল না। ঐ অবস্থায় বাহ্য এবং অন্তর্জ্জগতের বিষয় সকল যুগপৎ আমার অনুভূতির মধ্যে আসিল, সকল বিষয়ই আমি প্রত্যক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

চারিদিকে মনমুগ্ধকারী বহু দৃশ্য থাকিলেও পূর্ব্বসংস্কারানুরূপ ইষ্টচিন্তা করিতেই অতি উর্দ্ধে একটি জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল দেখিতে পাইলাম। ক্রমে সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলটী ঘনীভূত হইয়া আমার ধ্যেয় ইষ্টরূপে মূর্ত্তমান হইয়া ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সে সময় যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। *** ক্রমে সেই মূর্ত্তি আমার সম্মুখে দেখিলাম। *** পরিশেষে সেই মূর্ত্তি পুনঃ জ্যোতিঃতে বিলীন হইয়া ঊর্দ্ধ, অধঃ পার্শ্বদিক্-বিদিক্ সমস্তই যেন জ্যোতিঃ-পারাবারে নিমজ্জিত করিল। **হঠাৎ জানিনা, কিরূপে,কখন আবার সেইদিন এই দৈহিক অনুভূতির মধ্যে ফিরিয়া

আসিয়াছিলাম। ঐরূপ মৃত বা অর্দ্ধমৃতাবস্থায় আমার পার্শ্বে কেহই ছিলনা। আবার সেই রোগ-যাতনা অনুভব করিতে লাগিলাম। অস্ফুট স্বরে ডাকিলাম শান্তি!—জ—ল; কোথায় জল! চোখের জলেই পিপাসা মিটাইলাম। বেলা অনুমান একটা দেড়টার সময় বন্ধুটী কর্ম্ম-স্থান হইতে ফিরিয়া মাথায় জল ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলাম। ***

আমি ১৩৩৮ সালের ১ লা জ্যৈষ্ঠ দার্জ্জিলিং ধর্ম্মশালায় সান্ধ্যবন্দনা করিতে বসিয়া জয়দেবকৃত একটী গান গাহিতেছিলাম,—গানের সুরে আমি আপনিই আপনহারা! কতক্ষণে চমক ভাঙ্গিল, শুনিলাম, বীণা-নিন্দিতস্বরে কে যেন ডাকিল—"ছ্যামা!" কত দরদ-মাখান স্নেহেভেজা সে-সুর! কালোমেঘের মত ঢেউতোলা একরাশ চুলের ফাঁকে চাঁদপানা একখানা মুখ আমারই মুখের'পর মুখ তুলিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া,—দেশ কালের ব্যবধান ভুলিয়া বিহ্বলের মত ছুটিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া নিতে যাইতেই বুঝিবা সে-চাঁদের সুষমা শুখাইয়া গেল। শূন্য বাহু, শূন্য হৃদয় মহাশূন্যের মধ্যে বাণবিদ্ধ পাখীর ন্যায় যেন "গোপাল—গোপাল বলিয়া" প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পত্রে জানিতে পারিলাম, সেই দেবশিশুটী সেইদিন ঠিক সেই সময়েই রাত্র ৮ ঘটিকায় মাটির-মায়া কাটিয়াছে। ছেলেটী আমাকে বড় বেশী ভালবাসিত। স্নেহেরই মৃত্যু হয় দেহীর মৃত্যু হয় না। বুঝিলাম প্রীতির বন্ধন প্রাণের-টান মৃত্যুরপরও কত প্রবল!!

কক্সবাজারের প্রবীণ উকিল রায় সাহেব বিপিন বিহারী বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন "মাতার আসন্ন মৃত্যু-সংবাদ জানিয়াও নৈসর্গিক

দুর্য্যোগ বশতঃ মাতৃসমীপে উপনীত হইতে পারি নাই। সেইদিন নিশীথ সময়ে স্বপ্নে দেখিলাম, সান্ত্বনাবাক্যে মা বিদায় চাহিতেছেন। জাগ্রত হইয়াও স্পষ্ট দেখিলাম, শুচী শুভ্রবসন পরিহিতা জননী অতি ধীর পদসঞ্চালনে আমার শিয়র হইতে দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। প্রাতে সংবাদ পাইলাম, মা ঠিক সেই সময়েই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের ১৯ শে চৈত্র বুধবার রাত্র দেড় ঘটিকার সময় যোগনিদ্রা প্রভাবে স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মা আনয়ন করা হইয়াছিল। তিনি পরলোক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটা কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—

আমি মৃত্যু সময় দেবদেব বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়াছিলাম। তখন কর্পূর-ধবলবর্ণ দিব্যমাল্য বিভূষিত জ্যোতির্ম্ময় তনুতে বাবা বিশ্বনাথ আবির্ভূত হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। যে স্থানে আছি পৌরাণিক ভাষায় ইহাকেই স্বর্গ বলে।

প্রশ্ন। আপনার আর জন্ম হইবে কি?

উত্তর। ভোগান্তে জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন। আপনার লিখিত 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পুস্তক খানা পড়িয়া আপনার নিজের ধর্ম্মজ্ঞান অনুমান করিতে পারি কি?

উঃ। না,না, আমি ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু বা প্রচারক নহি। সুতরাং কোন ধর্ম্মমত প্রচার করা ও আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল এক শ্রেণী লোকের হিন্দুধর্ম্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য আমি ইংরেজী মুগ্ধ, ইংরেজী অনুকরণ লুব্ধ, অপ্রবুদ্ধ এবং পর-প্রবোধন- প্রয়োজনে

স্বয়ম্ভুশুদ্ধ জয়ঢাক বাহকের ন্যায় ইংরেজী শিক্ষা-ক্ষিপ্ত ও পাশ্চাত্য সভ্যতা-দীপ্ত হিন্দুদিগকে জাতীয় ধর্ম্মে তৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছি, শিক্ষিতগণের অভিমানের বোঝা নামাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

প্রশ্ন। তাহারা যে নূতন ভ্রমে পতিত হইতেছে ?

উঃ। হউক। জাতীয় ধর্ম্মে অবস্থান, জাতীয় আচার নিষ্ঠ হিন্দু ভুল বুঝিলেও, নাস্তিক, পাষণ্ড বা পরধর্ম্মলোলুপহিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি জানিতাম, তত্ত্বজ্ঞহিন্দু মদ্রচিত 'ধর্ম্মতত্ত্ব'কে তৃণের মত পরিত্যাগ করিবে। কেবল উচ্ছৃঙ্খল ম্লেচ্ছ পদানুসরণকারী শিক্ষিত আখ্যাধারী হিন্দুগণই আমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, যে কোনও ধারণায় হিন্দু একবার জাতীয়ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেই একদিন এমন সময় আসিবে যে, আপনা হইতেই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে। কেননা, বিশ্বাস থাকিলে সত্য আপনা হইতেই আলোকের ন্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন। যদিও সময় সাপেক্ষ, তথাপি অনুশীলন ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত ; কিন্তু শারীরিক বৃত্তি,জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি,কার্য্যকারিণীবৃত্তি, চিত্তরঞ্জনীবৃত্তি প্রভৃতিএতগুলির অনুশীলন করিতে যাই কেন ? যে সকলবৃত্তি নিত্য তাহার অনুশীলন আবশ্যক বটে ; যাহা অনিত্য তাহার অনুশীলনে বৃথা জীবন যাপন করিয়া প্রকৃত পথের দূরতা বৃদ্ধি করিব কেন ?

উঃ। ধর্ম্মতত্ত্বের শিষ্যরত্নটীকে স্মরণ করিলেই উত্তর সহজ হইবে। যে পরকাল মানে না, জন্মান্তর স্বীকার করে না, তাহাকে নিত্যতা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাই আমি পরকাল বাদ দিয়া ইহকালে সুখের উপর যে ধর্ম্ম, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

মানুষ যাহাতে পাশব প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, আমি তাহারই জন্য যত্ন করিয়াছিলাম। শিক্ষিত ব্যক্তির প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় আমার প্রতীতি হয় যে, ইহাদের মনের মত ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে না পারিলে কেহই হিন্দুধর্ম্মে আকৃষ্ট হইবে না। ধর্ম্মকে তাহাদের মুখোরোচক করিতে গিয়াই আমাকে শ্লোকের অঙ্গকর্ত্তন, কুসংস্কার খণ্ডন বা স্থলবিশেষে শাস্ত্র ভাগকে অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে।

প্রশ্ন। আপনি চৈতন্য ,বুদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি অবতারগণের প্রচারিত ধর্ম্মমতকেও অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন !

উঃ। দেশ,কাল,পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাকে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল। তমঃপ্রধান জড়বাদী হিন্দুগণের হৃদয়ে রজঃগুণের উদ্রেগ করাই আমার উদ্দ্যেশ্য। তাই বুদ্ধওচৈতন্যের সাত্বিকধর্ম্ম দূরে রাখিয়া রাজসিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছি । যে বালক হাঁটিতে শিখে নাই তাহাকে দৌড়াইতে উপদেশ দেওয়া সমীচীন নহে। যদিও আমি প্রত্যক্ষ্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, তবুও ব্যবহারিকজ্ঞানে ধর্ম্মের স্থূলভাব যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাও ঠিক "ধর্ম্মতত্ত্বে'প্রকাশ করি নাই। আমি মুনি, ঋষিগণের প্রচারিত শাস্ত্রকে ভগবৎবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় আমি ধর্ম্মবলহীন হইলে কখনই বিধবাবিবাহে তীব্র প্রতিবাদ করিতাম না । আমার উদ্দেশ্য 'যেন তেন প্রকারেণ' অনুকরণপ্রিয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে হিন্দুধর্ম্মে আকৃষ্ট করা ; সুতরাং তাহাদের মন বুঝিয়া, কার্য্যদেখিয়া তাহাদের মনমত করিয়া ধর্ম্মকে বাহির করিতে হইয়াছে। যে আধ্যাত্মিক জগৎ স্বীকার করে না, তাহাকে যে বিষয়ে কি উপদেশ দিব ? কাজেই

আমি শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্মের চিত্র দেখাইয়াছিলাম।

প্রশ্ন। আমি আপনার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া প্রতিবাদ করিয়াছি, এখন এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধটী মুদ্রিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।

উঃ। প্রতিবাদ প্রবন্ধটী প্রচারিত হইলে সমাজের উপকার হইবে। হিন্দু এখন বাহ্যসম্পদে মুগ্ধ,তাই আমি নিবৃত্তিমার্গ তৃণাচ্ছাদিত করিয়া প্রবৃত্তিমার্গ প্রশস্ত করিয়াছি, এই প্রতিবাদে সে জীর্ণতৃণ উড়িয়া যাইবে *** আমার ভ্রম কেহ সমাজকে জানায় না বলিয়া আমি অশান্তি ভোগ করিয়াছি। আজি তোমার দ্বারা সে অশান্তিটুকু দূর হইল। *** এখন নিশ্চিন্তমনে যথাস্থানে গমন করিলাম।

মেস্‌মেরিজিম্ প্রক্রিয়াদ্বারা গাঢ়নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির সংজ্ঞাহীনদেহে পরলোকগত আত্মা আনয়ন করিলে কোনও কোনও আত্মা এরূপ উৎকট পাপাদি যাতনা ভোগ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ করে যে, তাহা শ্রবণ করিলে একদিকে যেমন তাহাদের দুঃখে মনে নিতান্ত দুঃখের উদ্রেক হয়, অপরদিকে নিজের পরিণাম ও জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া অলক্ষ্যে যেন হৃদয় ভয়ে শিহরিয়া উঠে। একবার একটি নীচজাতীয় বালককে যোগনিদ্রাভিভূত করা হইলে বালক-দেহে আগত কোনও পাপী আত্মা মর্ম্মান্তক যাতনা ভোগ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। বারংবার প্রশ্ন করিয়াও আত্মার কোন উত্তর না পাওয়ায়, পরিশেষে হরিনামের ভীতিপ্রদর্শণ করাইলে আত্মা নিতান্ত ভীত হইয়া উত্তরদিতে আরম্ভ করিল। এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, পরলোকগত পাপী আত্মা হরি, কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতি ঈশ্বরের নাম, এমনকি তদ্ভাব-ব্যঞ্জক কোনও নামই

শ্রবণ করিতে পারে না। ভগবানের যে কোন নামই উচ্চারণ করা মাত্র সেই সকল প্রেতাত্মা যেন ভয়ানক যাতনা পাইয়া, অতি দীন ভাবে কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া থাকে এবং আর সেই নাম উচ্চারণ না করিতে অতি ব্যাকুলভাবে অনুনয় বিনয় করে। অবশ্য সকল প্রেতাত্মার একরূপ অবস্থা নহে।

সুধামাখা হরিনামে ত্রিতাপ জ্বালার শান্তি না হইয়া, তাহাতে পাপ যাতনার বৃদ্ধি হয় কেন? এ রহস্য আপাততঃ দুর্বোধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। অনেক প্রেতাত্মাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভগবানের কোনও নাম শ্রবণ করিলে তাহাদের মনে ভয়ানক ত্রাসের উদ্রেক হয়। তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারে না। সুমধুর হরিনাম শ্রবণে পাপীর পাপ যাতনার লাঘব না হইয়া তাহার যাতনার বৃদ্ধি হওয়া নিতান্তই অস্বাভাবিক ও বিস্ময়জনক ব্যাপার বটে। তবে এইরূপ হইতে পারে যে কোনও কঠিনরোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে অতিরিক্ত তিক্ততেজস্কর ঔষধ সেবন করিতে বলিলে সে যেমন রোগযাতনা ভোগ করিতেও স্বীকার করে তথাপিও ঔষধ সেবন করিতে চাহে না, অথবা ক্ষতস্থানে তীব্রতেজস্কর ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী যেমন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, উৎকট পাপীর পক্ষে ভগবানের নাম ও তদ্রূপ তেজস্কর-পাপসন্তাপহারী ঔষধ বলিয়া ভয়ে ঐ নাম উচ্চারণ করিতে ও শ্রবণ করিতে ত্রাসিত হয়। পাপী প্রেতাত্মা যন্ত্রনা ভোগ করিতেও প্রস্তুত হয়, তথাপি ভগবানের নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ করিয়া পাপ-যাতনা প্রশমিত করিতে সম্মত হয় না।

ভগবানের নাম শ্রবণে পাপাত্মার যাতনা বৃদ্ধির অপর কারণ এই যে, ঘোর অপরাধী ব্যক্তি যেমন বিচারকর্ত্তার নাম শ্রবণ করিয়া কঠোর দণ্ডভয়ে কম্পিত হয় তদ্রূপ ঘোরপাপাচারী আত্মাও সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বকার্য্যেরফলদাতা ন্যায়বান অভ্রান্ত বিচারকর্ত্তা ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণে ত্রাসিত ও কম্পিত হইয়া থাকে। নতুবা হরিনাম কখনই পরিণামে অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে না। ভগবানের নাম চিরকালই পাপীর ত্রিতাপ-যাতনা নিবারণের নিদান। যাহাইহউক হরিনাম উচ্চারণের ভীতিপ্রদর্শন করিলে বালক-দেহাশ্রয়ী পূর্ব্বোক্ত প্রেতাত্মা ভীত হইয়া আত্ম পরিচয় দিতে বাধ্য হইল। আত্মা বলিল :—"সংসারে থাকিতে আমার নাম ছিল মদনমোহন ভট্টাচার্য্য, বাড়ীছিল ঢাকা বাবুরবাজার (তৎপর বলিল) ওয়ারী। ত্রিশ বৎসর হইল কাশ ও জ্বরে আমার মৃত্যু হইয়াছে, আমি ঘোরতর পাপী কত পাপ করিয়াছি, কি না করিয়াছি ? আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন আমি কেমন আছি ; হায় ! হায় ! কোথায় যাই ? কোথায় থাকি স্থান পাই না, শান্তি নাই স্বস্তি নাই, হায় হায় !! কোথায় যাই সমস্ত পৃথিবী ঘুড়িয়া বেড়াই, কোথাও শান্তি পাই না।

তথায় এক রহস্যপ্রিয় উকিল বাবু উপস্থিত ছিলেন ; বোধ হইল তিনি প্রেতাত্মার নিদারুণ যাতনা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, তাহার হৃদয় যেন ব্যথিত হইল না, আত্ম-পরিণাম চিন্তাও যেন ক্ষণকালের জন্য তাহার হৃদয়ে উপস্থিত হইল না, কারণ সংসারে আমরা দেখিতে পাই, একই দৃশ্য দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শকের মনে

ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। পরের দুঃখ দেখিলে কেহ প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হন, কেহ বা তাহা দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। ভগবানের বিশাল রাজ্যে আলো আঁধার, সুধা গরল সকলই আছে; মানব চরিত্রে নানা বর্ণেরই চিত্র আছে। সে যাহা হউক তিনি প্রেতাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তুমি ব্রাহ্মণ নিতান্ত বেয়াদপ, ব্রাহ্মণ হইয়া হরিনাম (প্রেতাত্মা হরিনাম শ্রবণ করা মাত্র করুণ স্বরে বলিল, না-না, না-না, না-না !!) শুনিতে পার না এ কেমন কথা?" তৎপর তিনি উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বলিলেন "চলুন, আমরা সকলে মিলিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করি, দেখি সে কি করে।" অতঃপর বালক দেহাশ্রয়ী প্রেতাত্মার চারিদিক হইতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ হরিনাম গান আরম্ভ করিলেন। তখন বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় সেই দেহাশ্রয়ী প্রেতাত্মা এরূপ ছট্‌ফট্‌ ও করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল যে, সেই দৃশ্য দেখিয়া পরিণামদর্শী ব্যক্তি মাত্রই যে ভীত, মর্ম্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং ক্ষণকালের জন্যও যে আত্ম পরিণাম চিন্তায় অধীর হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎপর ঐ উকিল বাবু প্রেতাত্মাকে বলিলেন "তোমাকে সহজে ছাড়িব না, তোমার গায় হরিনাম লিখিয়া দিব।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা প্রেতাশ্রিত বালকদেহে (তদীয় বক্ষস্থলে) হরিনাম লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন প্রেতাত্মা এরূপ চীৎকার ও অসহ্য যাতনাব্যঞ্জক অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিল যেন প্রজ্জ্বলিত লৌহশলাকা দ্বারা তাহার অঙ্গে হরিনাম লিখিত হইতেছে।

তখন সেই হরিনাম লেখক বলিলেন ,'ওহে থাম থাম, একটু থাম "হরির "ই" কারটী বাকি র'য়েছে "ই" কারটী দিয়ে দি'।" এইরূপে আগত প্রেতাত্মা নিতান্ত যাতনা পাইয়া আর তথায় অপেক্ষা করিতে চাহিল না, আর্ত্তস্বরে বারংবার বিদায় প্রার্থনা করিতে লাগিল। আত্মাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল "আপনি এখন চলিয়া গেলে পুনঃ আহ্বান করিলে আপনি আসিবেন কিনা? আত্মা বলিল "আসিতে পারি কিনা কেমনে বলিব।" অতঃপর রাত্র অত্যধিক হওয়ায় তাহাকে বিদায় দেওয়া হইল। বলা হইল "আপনি এখন যাইতে পারেন।" এই কথা বলামাত্র সুষুপ্ত বালকের সংজ্ঞাহীন দেহে আত্মা আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন বালককে বিপরীত প্রক্রিয়া দ্বারা দুই এক মিনিট মধ্যে সচেতন বা জাগ্রত করা হইয়াছিল। বালকের নাম ধরিয়া ডাকিলে সে উত্তর দিল "আজ্ঞা"। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল "ঐ অজ্ঞানাবস্থায় তোমার কেমন বোধ হইতেছিল?" বালক বলিল "আজ্ঞে আমি কিছুই জানি না, বড় ঘুম পাইয়াছিল, এখন বড় ক্ষুধা পাইয়াছে" তৎপরে তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

মৃত্যুরপর আত্মার এতাদৃশ যাতনার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর এই যে, সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত লোকে পূর্ব্ব সংস্কার ও বৃত্তি লইয়া সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থানকালীন আত্মার সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি স্থূলদেহ দ্বারা কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া চিন্তাশক্তির সেই স্থূল অবস্থা হইতে শতাধিক গুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; অথচ ভোগসমর্থস্বরূপ কোন স্থূল আধার থাকে না, তাই তাহাদের যন্ত্রনার কারণ

হয়। প্রারব্ধ শেষ না হইলে যাহারা আত্মহত্যাদির দ্বারা দেহত্যাগ করে, সূক্ষ্ম অবস্থায় তাহাদের স্থূলের সেই প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয়, জীবিত অবস্থায় তাহার অশান্তির কারণ হইতে অব্যাহতি পাইতে স্থূলের অনেক প্রকার সাহায্য সে পাইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম অবস্থায় তাহার সেই যন্ত্রনা উপশমের কোনই উপায় থাকে না। মৃত্যুতে বৃত্তির ধ্বংস হয় না দেহেরই পরিবর্ত্তন হয় মাত্র, সুতরাং সুখ দুঃখ মানসিক অবস্থা স্থূল হইতে সূক্ষ্মেই অধিকতর রূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

আজকাল হয় শিক্ষার দোষে না হয় সংসর্গ দোষে অথবা বয়সের চাপল্যে অনেকেই পরকাল ও অদৃষ্টবাদ স্বীকার করেন না। কিন্তু পরিণামে একদিন সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার না করিলেও জীবন চিরস্থায়ী নয়, একদিন মরিতেই হইবে। ঐহিকের ক্ষণ সুখ সুবিধার জন্য নিয়ত পাপকর্ম্ম করিয়া পরিণাম বিষময় করিলে ফল কি? আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, আমরা নিশিদিন মরণের কোলেই বসিয়া আছি। সুতরাং "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন? কেননা, মৃত্যুর যখন কোন কালাকাল নির্দ্দেশ নাই তখন ধর্ম্মাধর্ম্মেরও কোন কালাকাল নিরূপিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে মন সংসারের বহু বিষয়ে ছড়াইয়া পড়ে, তখন সেই দুরন্ত মনকে একমুখীন করা আর সহজসাধ্য হয় না। তাই শাস্ত্রে বলে,—

যুবৈব ধর্ম্মশীল স্যাৎ অনিত্যং খলুজীবিতং।
কোহি জানাতি কস্যাত্ত মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥

মহাপুরুষগণ উপদেশ দিয়া থাকেন, পরের সুখ দেখিলে সুখী হইও,

ঈর্ষা করিও না। তুমি যেমন সর্ব্বতোভাবে আত্মদুঃখ নিবারণের চেষ্টা কর, অপরের দুঃখ দেখিলেও তদ্রূপ ইচ্ছা করিও, চিত্তের বৃত্তি সকল অনুশীলন সাপেক্ষ। প্রত্যেক অসদ্‌বৃত্তির পরিবর্ত্তে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন করিলে ক্রমশঃ চিত্তমল অপসারিত হইবে। ক্রোধের বিপরীত দয়া, কামের বিপরীত ভক্তি, এইরূপ প্রত্যেক রাজস ও তামস বৃত্তির বিপরীত সাত্বিক বৃত্তির অনুশীলন করিলে ক্রমে ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া উত্তমরূপ একাগ্রতাশক্তি সম্পন্ন হইবে। অভ্যাসের সমষ্টিই জীবের জীবন। জীবন প্রবৃত্তি মুখীন, নিবৃত্তির পথে পরিচালনই সাধনা। সাধনায় হৃদয় দর্পন পরিস্কৃত হইলেই আনন্দময় ভগবানের চিদ্‌ঘনমূর্ত্তি তাহাতে প্রতিফলিত হইবে। তবেই জীবন ধন্য, সাধনা সার্থক।

যোগ নিদ্রিত দেহে কোনও উচ্চ পদস্থ রাজকীয় কর্ম্মচারীর আত্মা আগমন করিয়া নিম্নলিখিতভাবে তদীয় পারলৌকিক অবস্থার কথা যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—"আপনি কে?" আমি *** (অমুক) ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। আমার পুত্রের ** (অমুকের নিকট একটী সংবাদ দিবার জন্য আসিয়াছি (সংবাদটি বলিয়া বলিল) এই সংবাদটি আমার পুত্রকে জানাইবেন। সংবাদটি যথা সময় তাহার পুত্রকে জানাইলে তিনি নিতান্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভাবিলেন "এতদিন পিতা মরিয়া গিয়াছেন এ সংবাদ ইহারা কিরূপে জানিল!" পুনঃ প্রশ্ন করিলে প্রেতাত্মা উত্তরে বলিলেন "আমি যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হই, তখন আমার মনে বেশ দয়াধর্ম্ম ছিল। আমি যখন প্রথম আসামীকে ফাটকের

হুকুম দিই তখন আসামীর কান্না দেখিয়া আমি স্বয়ং কাঁদিয়াছিলাম। তৎপর দোষী ব্যক্তিদিগকে সাজা দিতে দিতে মন ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল, তখন আর মনে কষ্ট হইত না। যখন জানিতে পারিলাম, বেশী বেশী শাস্তি দিলে শীঘ্র শীঘ্র কাজের উন্নতি হয় তখন সেই ঐহিক কার্য্যের উন্নতির প্রত্যাশায় দোষী নির্দ্দোষী বিবেচনা না করিয়া কত লোককে যে ফাটকে দিয়াছি তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। আমার অন্যায় হুকুমে কত লোক কারাগারে গিয়া কারাগারের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গিয়াছে! হায়! আমি কত স্ত্রীলোককে অনাথা করিয়াছি, কত শিশুকে পিতৃহীন ও নিরাশ্রয় করিয়াছি তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। ঐসকল ব্যক্তি মরিয়া পরলোকে আসিয়া এক্ষণে আমার অন্যায় কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য আমার প্রতি কতই না অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। আমাকে কত না যাতনা দিতেছে, প্রাণে আর যাতনা সহে না। এখন আর আমার সেই ডেপুটিগিরি নাই, আমি অতি নিরাশ্রয়। আমি ঐ সকল ক্রধোন্মত্ত ব্যক্তিগণকে কত অনুনয় বিনয় করি, তাহাদের পায়ে পড়ি, কতবার ক্ষমা ভিক্ষা চাই "ভাইসব আমি না বুঝিয়া অন্যায় যাহা করিয়াছি, আমাকে তোমরা ক্ষমা কর, আমাকে তোমরা রক্ষা কর," এই বলিয়া কত কাকুতি মিনতি করি, কিন্তু তাহারা কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া দেয় না। হায়! হায়!! কি কুকার্য্যই করিয়াছি। কোথায় যাই? এখন উপায়? বুঝিয়াছিলাম দিন বুঝি এই ভাবেই যাইবে। পাপের দণ্ডদাতা যে একজন আমার উপরে আছেন, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মূহূর্ত্তের জন্যও তাহা আর চিন্তা

করি নাই। ভাই সকল! যদি পরকালে শান্তি চাও, তবে আমার মত হতভাগা কেহই হইও না। পরের অহিত করিও না, পার্থিব বিষয়ের জন্যই শুধু মত্ত হইও না, এখানে তাহার কিছুই পাইবে না, সে সকল না পাইলে বড় যাতনা বোধ হইবে, প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিবে।" এই বলিতে বলিতে আত্মা যাতনায় অধীর হইয়া "হায় কি করিয়াছি।" এই বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। আমরা উপস্থিত ব্যক্তিগণ আত্মাকে ভগবানের নাম করিতে বলিলে আগত আত্মা বিলাপ স্বরে বলিতে লাগিল "আমি সে নাম করিতে পারি না। দয়া করিয়া আমার হইয়া আপনারা নামকীর্ত্তন করুন" কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে তৎশ্রবণে আত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া 'আহা কি আরাম' এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

স্বীয় মৃত্যু সময় জানিবার উপায়।

জীবের মৃত্যু সময় নিকটবর্ত্তী হইলে তদীয় শরীরে বহুবিধ মৃত্যুলক্ষণ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঠিক কপোলের উপর ভ্রূদ্বয়ের একটু ঊর্দ্ধে রাখিয়া কব্জার প্রতি লক্ষ্য করিলে,উহা স্বভাবতঃ সরু দেখায়; যেদিন উক্ত মুষ্টি হইতে হাতের কব্জা পৃথক্ দৃষ্ট হইবে, সেইদিন হইতে ছয়মাস কাল মাত্র পরমায়ু আছে,জানিবে।

চোখের এককোণে একটু টিপিলে, চোখের মধ্যে তারার ন্যায় একটী জ্যোতিঃ দেখায়; যেদিন এই জ্যোতিঃ দেখা যাইবে না, তখন দশ দিন মাত্র পরমায়ু আছে জানিবে।

উপসংহার

সংসার জীবন-মরণের লীলাভূমি। সুতরাং ঐহিকের ক্ষণিক সুখ-সুবিধার জন্য পরিণাম দুঃখকারী কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইলে লাভ কি? রোগে ফুলিয়া স্থূলকায় হওয়া অপেক্ষা ক্ষীণকায় সুস্থদেহ যেমন বাঞ্ছনীয়, ধার্ম্মিক হইয়া তেমনই নিঃস্ব হওয়াও শ্রেয়। চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াও ভোগ প্রমত্ত মানব কত দীর্ঘকাল যে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার আর ইয়ত্তাই করিতে পারে না। ভ্রমান্ধ মানব অন্ততঃ বিশ্রাম সময়েও আত্ম চিন্তা করে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। আজ যে শিশুর নবনীত অঙ্গ সোহাগে শত চুম্বন করিতেছে, কাল হয়ত তাহার শব-দেহ শ্মশানে প্রোথিত হইতে পারে। আজ যে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠদেহে বিচরণ করিতেছে, কাল হয়ত তাহার সুন্দর দেহটী চিতানলে ভস্মীভূত হইতে পারে। আজ যে বীরদর্পে ধরাবক্ষ কম্পিত করি-তেছে কাল হয়ত তাহার জরাজীর্ণ দেহখানা ধূলায় লুটাইবে। অতএব দেহের এত গরব কেন? সংসারে জন্ম গ্রহণ করিলে সকলকেই যখন মরিতে হইবে, তখন যেন "হায়! কি করিয়া জীবন কাটাইলাম" এই বলিয়া অনুতাপ করিয়া মরিতে না হয়। আমাদের মনে রাখা উচিত "Paths of glory lead but to the grave" ঐহিকের কীর্ত্তি শ্মশানেই সমাপ্ত।

ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

শ্রীশ্রীগুর্ব্বর্পণমস্তু॥

সমাপ্ত

গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তকাবলী।

১।	গুরুগীতি (ধর্ম্মসঙ্গীত।)	।।০
২।	মরণ-রহস্য	১৲

অশ্রু।

"অশ্রু" ব্যথিত-হৃদয়-মথিত আবেগ উচ্ছ্বাস, সঙ্গীতাকারে লিপিবদ্ধ।

অশ্রুর সঙ্গীত সাধনার সঙ্কেত, শোকের শান্তনা, চিত্ততোষনের উপায়। সুন্দর এন্টিক কাগজে, রঙ্গীন কালিতে মুদ্রিত, উত্তম বাঁধাই মূল্য এক টাকা মাত্র।

অভিশপ্ত।

জন্মান্তর রহস্য মূলক অভিনব দার্শনিক উপন্যাস। নশ্বর দেহের বিনাশ হইলেও ভালবাসার পবিত্র সূত্র, কেমন করিয়া জন্মান্তরের বিচিত্রপথে পরস্পর পরস্পরকে মিলনের একসূত্রে গাঁথে, বাসনার ফুল কর্ম্মের বীজ কেমন করিয়া সময়ে পাতা পাঁপড়ী মেলিয়া মানব-হৃদয়ে ফোটে ইত্যাদী বিবিধ রহস্য মূলক ঘটনায় পূর্ণ অপূর্ব্ব উপন্যাস (যন্ত্রস্থ)।

প্রাপ্তিস্থান—
গোপাল ভবন, আলীপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ী।
ও
শৈলেন্দ্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, তেজপুর, আসাম।